# বিদায়, অবন্তী!

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

# বিদায়, অবন্তী

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

পার্ল পাবলিকেশন্স

তৃতীয় মুদ্রণ : এপ্রিল ২০১৩
দ্বিতীয় মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর ২০০৫
প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫

©
লেখক

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

ISBN : 984-495-147-X

পার্ল পাবলিকেশন্স ৩৮/২, বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে হাসান জায়েদী কর্তৃক প্রকাশিত এবং একুশে প্রিন্টার্স থেকে মুদ্রিত। অক্ষর বিন্যাসে শাওন কম্পিউটারস্।

মূল্য : ১০০.০০ টাকা

উৎসর্গ
লুনাকে
আব্বু

নানান পারম্পর্যহীন উপলক্ষে গোটাকয় স্মৃতিমূলক রচনা লিখেছিলাম বিভিন্ন সময়ে। পাশাপাশি পড়তে গিয়ে মনে হল আপাত বিছিন্ন এই লেখাগুলোর ভেতর দিয়ে আমার নিজস্ব প্রাণ-চেতনার একটা সূক্ষ্ম অভিন্ন স্রোত অচঞ্চল ধারায় বয়ে চলেছে। এই অনুভূতি থেকে লেখাগুলোকে এক প্রচ্ছদের নিচে একত্রিত করার এই প্রয়াস।

বইটি প্রকাশের পর্বে স্নেহাস্পদ আহমাদ মাযহার ও লুৎফর রহমান রিটন-এর কাছ থেকে যে সহযোগিতা পেয়েছি তা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি।

'অনিশ্চিত কালবেলায়' রচনার নির্দেশ ও মুহুর্মুহু তাড়না দেবার জন্য নাহিদ আহসান এবং লেখায় সাহায্য করার জন্য মনজুর হোসাইন ও নূরুল্লাহ আজাদ-এর কাছে আমি ঋণী।

**আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ**
২৩ ইস্কাটন গার্ডেন
ঢাকা
১১.০১.৯৫

## জাহানারা ইমাম

পঞ্চাশের দশকে আমরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, জাহানারা ইমাম তখন ঢাকা শহরের সুচিত্রা সেন। সেকালে, সেই পঞ্চাশের দশকে, প্রতিটা বাঙালি মেয়েই সুচিত্রা সেন হতে চাইত। নায়িকা হিশেবে জনপ্রিয়তায় সুচিত্রা সেন তখন তাঁর শিল্পী জীবনের শীর্ষে। বাঙালিরা তাদের আরাধ্য নারীর ভেতর যে দুর্লভ গুণগুলো খুঁজে বেড়ায় এবং ভবিষ্যতেও খুঁজবে বলে মনে হয়—সৌন্দর্যে, ব্যক্তিত্বে, পরিশীলনে এবং মাধুর্যে তিনি ছিলেন তার নিকটতম উপমা। এখন চলচ্চিত্রের যুগ শেষ হয়ে টেলিভিশনের উত্তেজনামুখর ছোট পর্দার ক্ষিপ্রচটুল অপসৃয়মান যুগের পদপাত ঘটেছে। এমন যুগে সারা জাতির শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় অভিষিক্ত, আরাধ্য এবং অপ্রাপনীয় এমনি কোনো সর্বজনীন পরমাকে খুঁজে পাওয়া সহজ হবে বলে মনে হয় না।

এমন পরিস্থিতিতে দেশের প্রতিটা মেয়ের সুচিত্রা সেন হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষা অবাস্তব নয়। হয়েছিলও তাই। তাঁরা সুচিত্রা সেনের ঢঙে শাড়ি পরতেন, খোঁপা বাঁধতেন, মাথার মাঝ বরাবর সিঁথি করে সামনের চুলগুলোকে দুদিকে আলতোভাবে উঁচিয়ে বিছিয়ে দিতেন এবং তাঁরই মতই দৃপ্ত ঋজু গ্রীবা ঈষৎ হেলিয়ে বিনীতা অপরূপা হতে চাইতেন। জাহানারা ইমামের সঙ্গে সে-সময়ের অন্য মেয়েদের পার্থক্য এখানে যে, তাঁরা সবাই সুচিত্রা সেন 'হতে চেয়েছিলেন', আর জাহানারা ইমাম তা 'হয়েছিলেন'।

প্রথম দিন জাহানারা ইমামকে দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। কী করে কোলকাতা থেকে এত দূরে, এই ঢাকা শহরে, অবিকল একই রকম একজন সুচিত্রা সেন থাকতে পারেন, যিনি পর্দার অলীক নায়িকা নন, একজন বাস্তব মানুষ, তাঁরই মত হেঁটে ফিরে বেড়ান, হাসেন, কথা বলেন! বাঙালিরা নানা জাতির সমাহার। একজনের সঙ্গে আরেকজনের চেহরার মিল নেই। প্রত্যেকের ভেতরেই ভিন্ন ভিন্ন জাতিগত বৈশিষ্ট্য আলাদা অঙ্গপ্রত্যঙ্গে অমিলভাবে ছড়িয়ে আছে। আমার ধারণা আজ পৃথিবীতে যতজন বঙ্গভাষী আছে ততজন আলাদা চেহারার বাঙালি আছে। তবুও মাঝেমাঝেই বাঙালির সমিল অবয়ব আমাকে বিমূঢ় করে। আমি এ যাবৎ বাংলাদেশে অবিকল শেখ মুজিবের মতো দেখতে অন্তত তিনজন মানুষ দেখেছি।

আমরা যখন এম. এ. শেষ পর্বের ছাত্র, তখন, উনিশ শ ষাট-একষট্টির দিকে হতবাক হয়ে দেখলাম, সেই সুচিত্রা সেন, আমারই বিভাগে, বাংলায়, এম. এ. প্রথম পর্বে এসে ভর্তি হয়েছেন। তিনি তখন সম্ভবত সিদ্ধেশ্বরীর কোনো মেয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা বা

শিক্ষিকা। বি.এ. তিনি অনেক আগেই পাশ করেছিলেন, নানান কারণে এম.এ. পড়াটা হয়ে ওঠে নি, সেটা শেষ করে নিতে চান। সামনাসামনি একজন চলমান সুচিত্রা সেনকে রোজ রোজ দেখতে পাবার কথা ভেবে উৎসাহিত হলাম।

দিন কয়েকের মধ্যেই তাঁর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ এল। সে সময়কার বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবন ছিল মেডিকেল কলেজের দক্ষিণ অংশ জুড়ে, যার পুব ধারের বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের অফিস এখন হাসপাতালের জরুরি বিভাগ—রক্তাক্ত ছিন্নভিন্ন রোগীদের যন্ত্রণা আর কাতরোক্তির অবিশ্রাম আর্তনাদমুখর চৌহদ্দি। আর আমাদের সেই শ্রেণীকক্ষগুলো, যেখানে আমাদের রক্তিম স্বপ্নেরা এক এক করে পাপড়ি মেলেছিল সেগুলো এখন দুঃস্বপ্নগ্রস্ত রোগীদের ওয়ার্ড। আর কলা ভবনের আঙিনার মাঝখানটার যে আমতলা থেকে একদিন ঐতিহাসিক রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন জন্ম নিয়েছিল সেই আমগাছের চিহ্ন আজ কোথাও নেই।

বাংলা বিভাগের পাঠকক্ষের বারান্দা দিয়ে আমরা জনাতিনেক ছাত্র হেঁটে যাচ্ছিলাম, তাঁর সঙ্গে দেখা হতেই কথা শুরু হল। তাঁর ফুটফুটে সুন্দর জীবন্ত ত্বক তখনো তাঁর সারা অবয়ব জুড়ে বিভা ছড়াচ্ছে। আমাদের দলের একজন তাঁর পরিচিত ছিল, তাকে দেখে নিজে থেকেই কথা শুরু করলেন তিনি। এক-দুই বার আমিও কথাবার্তায় যোগ দিলাম।

প্রতিটা মানুষের জীবনে, বিশেষ করে তরুণ বয়সে এমন একটা সময় যায় যখন নিজের মুখটাকে সবার সামনে বাল্বের মতো উঁচু করে তুলে ধরতে সাধ জাগে। নিজেকে সবার সামনে পরিচিত স্বীকৃত প্রতিষ্ঠিত দেখার ইচ্ছায় হৃদয় উন্মুখ হয়। সবাই আমার দিকে একটু তাকাক, আমাকে একটু লক্ষ্য করুক, চোখে সপ্রশংস বিস্ময় ফুটিয়ে এক-আধটু উচ্ছ্বসিত হোক, এমনি একটা আকাঙ্ক্ষা ভেতরে ভেতরে আকুলি বিকুলি করতে থাকে। আমার মনে হয় কেবল ঐ বিশেষ বয়সে নয়, সব বয়সের মানুষের ভেতরেই কাজ করে ব্যাপারটা, জীবনের সাফল্যের মাত্রার সঙ্গে সঙ্গে বয়সের বিভিন্ন পর্বে এর চরিত্র আর তীব্রতার পার্থক্য হয়। আমি তখন অপরিচিত মফস্বল থেকে আসা নাম-পরিচয়হীন তরুণ, আমার ভেতর এই উৎসাহ এক-আধটু বাড়াবাড়ির পর্যায়েই হয়ত ছিল। সবখানেই নিজেকে একটু রঙ চড়িয়ে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলে ধরার ইচ্ছা মাঝেমাঝেই সৌজন্যের সীমা ছাড়াত। কে কী ভাবছে বা বলছে তা নিজেকে বুঝতে দিলেও সেখানে বোকামি, আকাঙ্ক্ষাটাকে অবাধে পুরোপুরি তুলে ধরা যাবে না।

তাঁর কাছে নিজেকে কেউকেটা প্রমাণ করার নেশা বোধহয় একটু বেশি মাত্রাতেই পেয়ে বসেছিল। হঠাৎ কথায় কথায় কী একটা ব্যাপারে একটা জাঁকালো মন্তব্য করে বসেছিলাম। আমার এই ছোট্ট নিরপরাধ কথাটা আমার জন্য যে কতখানি দুর্ভাগ্য বয়ে আনতে পারে, ভাবতে পারি নি। আমার কথা শেষ হতে পারল না। প্রায় সম্পূর্ণ কারণহীনভাবেই ফেটে পড়লেন তিনি। তাঁর চেহারা পাল্টে গেল। মুখ ভয়ংকর হয়ে উঠল। আমার উক্তিটিকে তিনি নির্দয় চাবুকে ছিন্ন ভিন্ন করে চললেন। যেন তার ওপর অনুষ্ঠিত কোনো জগৎ-ব্যাপী অন্যায়ের ক্ষিপ্ত প্রত্যুত্তর দিচ্ছেন তিনি। তাঁর চোখ থেকে উত্তপ্ত তীব্র আগ্নেয় হলকা আমি বেরিয়ে আসছে দেখতে পেলাম।

আমি জানিনা আমার কী ত্রুটি হয়েছিল। আমি কি না জেনে তাঁর জীবনের করুণ ও অসহায় কোনো জায়গায় অযাচিত আঘাত করে বসেছিলাম? সে যাই হোক, তাঁর

সেদিনকার সেই নির্মমতা আমার কাছে ঠিক স্বাভাবিক মনে হয় নি। বরং স্নায়ুর অসুস্থ উত্তেজনা ঘটিত এক ধরনের নিয়ন্ত্রণহীন মানসিক অবস্থা বলেই মনে হয়েছিল।

রাগলে কাউকেই সুন্দর দেখায় না এমনকি সুচিত্রা সেনদেরও নয়। ওটা হতে পারে শিল্পের মঞ্চে, যেখানে ক্রোধকে মধুর রূপে ফুটিয়ে তোলা হয়। বাস্তব জীবনের রাগ সবসময়ই দৃষ্টিকটু। আমাদের ঢাকার সুচিত্রা সেনকেও সেদিন সুন্দর মনে হয় নি। তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে কিছুক্ষণ আগেই হতাশ হয়েছিলাম। তাঁর ক্রোধ আমার সেই হতাশাকে আরও প্রকট করে দিল।

আগেই বলেছি আমি তখন মফস্বল শহর থেকে আসা নিতান্ত গোবেচারী তরুণ। একটা স্ত্রীবর্জিত পৃথিবীতে আমাদের শৈশব কেটেছে। সুন্দরী অত্যাধুনিক মহিলা দূরের কথা, সাধারণ আটপৌরে মহিলা দেখার সুযোগও প্রায় আমাদের ছিল না। নারী মাত্রই তখনো আমাদের কাছে দেবী। সুন্দরী রমণী দেখার যা একটু-আধটু সুযোগ ছিল তা কেবলই সিনেমার পর্দায়। সেখানে আমাদের স্বপ্নের সবকিছুই ঘটতে পারে। সে জগৎ অবাস্তব। রাগও সেখানে সৌন্দর্যময় ও অনিন্দ্য। কিন্তু বাস্তব সুন্দরীদের তাই বলে এত ক্ষমাহীন, এত নির্মম হতে হবে? আত্ম-অবমাননার অকথ্য কষ্ট আমার ভেতরটাকে ক্ষতবিক্ষত আর অবসন্ন করে তুলল। মানবীর সৌন্দর্য আমাকে সন্ত্রস্ত করে দিল। সেই মানসিক বৈকল্য কাটাতে আমার অনেক সময় লেগেছিল।

আমার ছেলেবেলা থেকে আজ পর্যন্ত আমি আমার চারপাশে অনুভূতিসম্পন্ন ও প্রতিভাবান এমন মহিলা কমই দেখেছি যিনি মানসিকভাবে পুরোপুরি সুস্থ। এমন অবিবেকী, হৃদয়হীন আর অত্যাচারী এই সমাজ, এমন নিষ্ঠুর আর আর বর্বরোচিত যে মহিলা তো দূরের কথা, প্রতিভাবান পুরুষদের পক্ষেও এই সমাজে মানসিক সুস্থতা বজায় রাখা কঠিন। প্রতিভাবান মানুষদের চৈতন্যজগৎ এমনিতেই সাধারণ মানুষদের চেয়ে দীপ্র ও দ্যুতিময়। তাঁদের অনুভূতিশীলতা ও স্পর্শকাতরতা তুলনামূলকভাবে বেশি। অল্প আঘাতে এঁরা কুঁকড়ে যান। তাঁদের ইচ্ছা ও স্বপ্ন, প্রাপ্য ও প্রাপ্তি সাধারণ মানুষ থেকে বিপুলভাবে আলাদা। এই পৃথিবীকে পাল্টে যারা নতুন পৃথিবী তৈরি করবে, ভিন্নপথে মোড় ফেরাবে, ধরেই নিতে হবে তাদের চাওয়া-পাওয়া চেতনা অনুভূতি ঠিক চারপাশের দশটা একাকার মানুষের সঙ্গে অভিন্ন হতে পারে না। কিন্তু সমষ্টির হিতের নামে এই মূঢ় ভেদাভেদহীন ভিড়ের জগৎ, কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে এইসব অনুভূতিসম্পন্ন ও স্পর্শকাতর হৃদয়ের ওপর এমন অমানবিক অত্যাচার চালায়, নিজেদের সাধারণত্বের স্থূল ও অভিন্ন আস্তিনের নিচে তাঁদের একাকার করে ফেলার জন্যে এমন নিষ্কৃতিহীন ও পাশবিক চাপ দিতে থাকে যে তাঁরা ধীরে ধীরে মানসিক সুস্থতা হারিয়ে ফেলতে শুরু করেন। প্রতিভাবান মানুষেরা এমনিতেই একটু তেড়িয়া। তাঁরা যুদ্ধপ্রিয় ও কলহপরায়ণ। মানুষের প্রতি সহজাত মমতা বেশি বলেই এঁরা চারপাশে অমানবিকতার সঙ্গে কলহপরায়ণ। শক্তিমান বলেই যুদ্ধপ্রিয়। চারপাশের বিবেকহীনতা এবং অন্যায়ের সঙ্গে তাঁরা বিরতিহীনভাবে যুদ্ধ করে চলেন। কিন্তু আমাদের সমাজের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের স্থূল ও অকর্ষিত আক্রমণ তাঁদের ক্রমাগতভাবে রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত করে ফেলতে থাকে। পুরুষেরা তবু তাদের শক্তিশালী সামাজিক অবস্থানের কারণে এই হামলা উৎরে কোনোমতে হয়ত মানসিক ভারসাম্য জিইয়ে রাখতে পারেন কিন্তু মহিলারা প্রায়শই ভেঙে পড়েন। এই সমাজে আজও পর্যন্ত

সম্মানজনক মানুষ হিশেবে একজন নারীর কোনো অবস্থান নেই। আদর্শ স্ত্রীর গুণপনা তুলে ধরতে গিয়ে মহাভারতে কৃষ্ণের স্ত্রী সত্যভামাকে দ্রৌপদী বলেছিলেন, সফল স্ত্রীর একটা গুণ হবে সে শুতে যাবে সবার শেষে, উঠবে সবার আগে। নারী জীবনের সার্থকতা সম্বন্ধে এইসব ধারণা আজও অবিকল একইরকম। আজও এ সমাজে একজন নারীর কোনো সামাজিক ভূমিকা নেই। তার শ্রম বা জীবনপাতের অর্থনৈতিক মূল্য বা স্বীকৃতি নেই—রবীন্দ্রনাথের 'নিষ্কৃতি' কবিতার সেই গৃহবধূর মতই রাঁধার পরে খাওয়া আর খাওয়ার পরে রাঁধার অর্থহীন চক্রাবর্তের ভেতরেই তার জীবন নিঃশেষিত। আজও আমাদের সমাজের একজন মেয়ে, সে যত বড় বা বৈভবশালী পরিবারেরই হোক, যখন স্বামীর ঘরে ঢোকে, তখন দাসী হয়েই তাকে সে ঘরে ঢুকতে হয়। সামাজিকভাবে পুরোপুরি অস্তিত্বহীন অবস্থানহীন এই পরিবেশে অনুভূতিসম্পন্ন সংবেদনশীল বা প্রতিভাবান হওয়া কিংবা এই সমাজের অব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তোলা একজন নারীর জন্য অমার্জনীয় ধৃষ্টতার পর্যায়েই পড়ে। সমস্ত মধ্যযুগের ইয়োরোপে এইসব প্রতিভাময়ী নারীদের ডাইনি আখ্যা দিয়ে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। ভারতীয় সভ্যতা প্রতিভার অপরাধে খনার মত জিভ কেটে নিয়ে বা গার্গীর মত মাথা খসে পড়ার ত্রাসের নিচে তাঁদের দমিত করে রেখেছে। আমাদের সমাজে যে মেয়ে কোনো অতিরিক্ত সম্পন্নতা বা শক্তি নিয়ে জন্মায়, প্রতিভার দণ্ড হিশেবে তার প্রতিটি পদক্ষেপের ওপর যে অকারণ হিংস্রতা এবং আক্রমণ চলতে থাকে তা তাকে একসময় সারা পৃথিবীর ওপর বিদ্বেষপরায়ণ ক্ষুব্ধ এবং তিক্ত করে তোলে। তার স্বাভাবিক সহনশীলতা ও মানসিক সুস্থিরতা নিজের অজান্তে নষ্ট হয়ে যায়। সবকিছুর ওপর অকারণে সে ক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। তাঁর মানসিক সুস্থতা হারিয়ে যায় এবং তাঁর ওপরে অনুষ্ঠিত এই উদ্ধারহীন ও বিশ্বজনীন অত্যাচারের প্রতিশোধ হিশেবে মরিয়া অবস্থায় নিজের অজান্তে শত্রুমিত্র সবার ওপর অকারণে ও নির্মমভাবে সে আক্রমণ চালাতে থাকে। যাঁরা জীবনে সাফল্যের মুখ দেখার সৌভাগ্য পান তাঁদের ভেতরকার এই অবদমিত ক্রোধ, প্রাপ্তিজনিত পরিতৃপ্তির কারণে, একসময় মনের সুস্থিত ভারসাম্য কমবেশি খুঁজে পায় হয়ত। কিন্তু যাঁদের জীবনে ঐ আকাঙ্ক্ষিত সাফল্য জোটে না বা অন্যায়জনকরকমে কম জোটে (নানান গ্রহণযোগ্য কারণেই অমনটা ঘটতে পারে) তাঁরা এক আক্রোশতিক্ত পৃথিবীর ভেতর, সবার বিরক্তি এবং বৈরিতা ঘটিয়ে অসুস্থভাবে জীবন শেষ করেন।

আমার ধারণা, জাহানারা ইমামের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের মুহূর্তে আমাকে যে অকারণ আক্রোশের শিকার হতে হয়েছিল তা আমাদের দেশের মহিলাদের ওপর অনুষ্ঠিত সমাজ ও পরিপার্শ্বের অযৌক্তিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে সার্বক্ষণিক ও অসমভাবে যুদ্ধরত একজন অনুভূতিসম্পন্ন ও প্রতিভাময়ী নারীর নিত্যনৈমিত্তিক নির্যাতনেরই তিক্ত প্রতিক্রিয়া। আট নয় বছর পর যখন তাঁর সঙ্গে আমার আবার পরিচয় হয় তখন তাঁর প্রকৃতিতে ঐ তিক্ততা আমি দেখি নি। তিনি তীব্র ও নিরাপোষ ছিলেন কিন্তু কোনোমতেই অপ্রীতিকর ছিলেন না। বরং ছিলেন উল্টো। আতিথ্যে এবং অন্তরঙ্গতায় তিনি সবাইকে তাঁর উত্তাপ-মধুর মানবিক সান্নিধ্যে টেনে নিতেন। আট নয় বছরে তাঁর এই পরিবর্তনের একটা কারণ অনুমান করা অসম্ভব নয়। ঐ সময়ের মধ্যে তিনি নানা দিকে নিজেকে ছড়িয়ে ছিলেন। নানান ধরনের সাফল্য তাঁকে সুমিত করেছিল। জীবনের পথে এগোবার সঙ্গে সঙ্গে মনের সুস্থিরতা এবং

সাফল্যের স্বস্তি ততদিনে তাঁর ভেতরকার সেই নিয়ন্ত্রণহীন ক্রোধ এবং তিক্ততাকে উন্নীত করেছে এক ধরনের আপোষহীন ভারসাম্যময় তেজস্বিতায়। গত কয়েক বছরে সারা জাতির হৃদয়ে আবহমান বাঙালিত্বের বিলীয়মান চেতনাকে পুনরুজ্জীবিত ও প্রজ্জ্বলিত করার এবং বিস্মৃত মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে নতুন প্রজন্মের কাছে ফিরিয়ে দেবার সংগ্রামে তিনি যে অনমনীয় নির্ভীক ও শক্তিশালী নেতৃত্ব দিয়েছেন তা তাঁর চরিত্রের এই দুর্লভ তেজস্বিতার জন্যেই সম্ভব হয়েছে। অনেক বছর আগে তাঁর চরিত্রের যে দৃপ্ত শক্তিকে আমি সার্বক্ষণিক সামাজিক উৎপীড়নের ফলে অকারণ ক্রোধে পর্যবসিত হয়ে অপচিত হতে দেখেছি একালের মৌলবাদীরা সেই শক্তিকে সুসংহত ও লক্ষ্যভেদী মারণাস্ত্ররূপে অনুভব করেছে।

উনিশ শতকের বাঙালিরা মানুষের ব্যক্তিত্বে এই তেজস্বিতার দিকটিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখতেন। ঐ কালটাই ছিল শক্তিমান মানুষ আর তাদের অভাবনীয় সব কর্মোদ্যোগের যুগ। অমানুষিক সংগ্রাম আর সাধনার ভেতর দিয়ে একেকজন মানুষ সে সময় সমাজে আত্মপ্রতিষ্ঠ হতেন। এজন্যে কীর্তিমান মানুষদের জীবনকালে বা মৃত্যুর পর তাদের নিয়ে জীবনী লেখার উৎসব পড়ে যেত। জীবনীগুলোতেও ঐসব মানুষদের গুণপনার উল্লেখ করত গিয়ে তাঁরা যে গুণটির কথা সবচেয়ে জোর দিয়ে উল্লেখ করতেন তা হচ্ছে এই তেজস্বিতা। একজন শক্তিমান মানুষের ব্যক্তিত্বে এই তেজস্বিতা অনিবার্য। দুঃসাধ্যের অনিশ্চিত যাত্রায় যাঁকে নিঃসঙ্গ সংগ্রাম চালিয়ে এগিয়ে যেতে হবে, তেজস্বিতার বিরল পাথেয় ছাড়া তিনি কী করে তা করবেন? ঐ যুগ বিশ্বাস করত জাতির ভূয়িষ্ঠ সম্ভাবনায়, আস্থা রাখত ব্যক্তির চারিত্রিক অখণ্ডতার ওপর। কিন্তু আমাদের কালে, চারপাশে অবাধ লুণ্ঠন আর নৈতিকতার দুরপনেয় পতন দেখে দেখে, সব ব্যাপারে আমরা সংশয়ীও নেতিবাদী হয়ে পড়েছি। আমাদের চারপাশেও শক্তিমান তেজস্বী মানুষের অভাব নেই, কিন্তু অবিশ্বাসে দ্বিখণ্ডিত আমরা তাদের শ্রেয়ত্বকে শ্রদ্ধা জানাতে অপারগ হচ্ছি।

২

জাহানারা ইমামের সঙ্গে আমার পরবর্তী যোগাযোগ বছর সাতেক পরে, তাঁর নিজের উৎসাহেই। ততদিনে আমাকে তিনি সম্পূর্ণ ভুলে গেছেন। মনে থাকা সম্ভবও নয়। কবে কোন পাঠকক্ষের বারান্দায় কোনো অপরিচিত একজন ছাত্রকে তিনি চিন্তার অবিমৃষ্যকারিতার জন্যে তিরস্কার করেছিলেন, তাকে কদিনই বা মনে রাখা যায়! হয়ত সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই সবকিছু ভুলে গিয়েছিলেন তিনি।

খুব সম্ভব উনিশ শ আটষট্টি সাল সেটা। টেলিভিশনে অনুষ্ঠান উপস্থাপনার বছর দেড়েক পার হয়েছে আমার। আমার অনুষ্ঠান ততদিনে জনপ্রিয়তা পেতে শুরু করেছে। একদিন স্কুটারে করে সায়েন্স ল্যাবরেটরির সামনে দিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ একটা ভোকসওয়াগন গাড়ি আমাকে পার হয়ে রাস্তার বাঁ দিকে চেপে আমার পথ আটকে দাঁড়িয়ে গেল। ঘটনার আকস্মিকতায় হতচকিত হয়ে গাড়ির ভেতরে তাকালাম ; দেখলাম, স্টিয়ারিং-এ বসে আছেন আমাদের সুচিত্রা সেন—সেই আগের মতই উজ্জ্বল আর অনিন্দ্য। সঙ্গে তাঁর দুই স্কুলে পড়া ছেলে, রুমী আর জামী। ঢাকা শহরে সে সময় হাতে গোনা যে পাঁচ-সাতজন মহিলা নিজেরা গাড়ি চালাতেন, তিনি তাঁদের একজন। তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের রূঢ় আঘাত অনেকদিন পর্যন্ত আমাকে বিপর্যস্ত করে রেখেছিল, তাঁকে দেখতেই আমি আমার

ভেতর সেই প্রাক্তন আতঙ্কের প্রত্যাবর্তন অনুভব করতে লাগলাম। কিন্তু তাঁর হাস্যোজ্জ্বল মুখ স্নিগ্ধ সকালের মত অভয় জানিয়ে গেল। না, ভয় নেই, মেঘ কেটে নির্মল আকাশ দেখা দিয়েছে। বোঝা গেল এই মানুষটি সম্পূর্ণ আলাদা। আদৌ প্রথম দিনের মত নন। আমরা তাঁকে যেমন ভাবতে ভালবাসতাম, ঠিক তেমনি। একটু অবাকই হলাম। আমাকে তিনি চিনলেন কী করে? কিছুতেই তো মনে থাকার কথা নয়। চকিতে একবার টেলিভিশনের কথা মনে হল। অসম্ভব নয়। দর্শকদের উৎসাহ নামে একটা ব্যাপারের সঙ্গে আমি ততদিনে অনেকখানিই পরিচিত।

আমি থেমে পড়তেই তিনি হাসি মুখে গাড়ি থেকে নেমে এলেন। সহজ স্বরে বললেন, একটু অভদ্রতা করলাম। আমার দুই ছেলে আপনার দারুন ফ্যান। আপনাকে দেখেই গাড়ির ভেতরে হৈ-চৈ লাগিয়ে দিল, বলে দুই ছেলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

তাঁর মুখে 'ফ্যান' শব্দটা শুনেই বুঝলাম যা আন্দাজ করেছিলাম তাই। টেলিভিশনের কারণেই রাস্তার ওপর এই অভাবিত বিস্ময়ের অবতারণা। আশ্চর্য এই নির্বোধ বাকশের মহিমা, একেকজন অকারণ মানুষকে রাতারাতি কোথায় উঠিয়ে ফেলে! তুচ্ছকে করে তোলে মূল্যবান, তিরস্কৃতকে পুরস্কৃত। আমাকে দেখে আমার ফ্যানদের চোখে মুখে কিন্তু ততটা উচ্ছলতা দেখা গেল না, যতটা দেখা গেল মায়ের চেহারায়। একেকবার সন্দেহ হল ছেলেদের বেনামীতে আসল ফ্যানটি তাঁর পরিচয় লুকিয়ে যাচ্ছেন না ত? ছেলে দুটো আমকে সামনাসামানি দেখে এমনিতেই লজ্জায় কাচুমাচু হয়ে গিয়েছিল। অবাক চোখে ওরা আমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন—

'কোথায় যাচ্ছেন?'

'নিউ মার্কেট।'

'আমরা নিউ মার্কেটের পাশেই থাকি, এলিফ্যান্ট রোডে। সময় থাকলে আসুন না আমাদের বাসায়। গল্প করতে করতে এক কাপ চা খেয়ে যাবেন।'

রাজি না হওয়ার কোনো উৎসাহ ছিল না। মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম।

'আমার গাড়ি ফলো করে আসুন, আমি আস্তে আস্তে চালাচ্ছি।' বলে গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিলেন। প্রতিটা কথায় আচরণে কী স্বতঃস্ফূর্ত রকম সহজ আর অকুণ্ঠ। কোথাও কোনো জড়তা বা সংকোচ নেই। তাঁর ভেতর একটা উচ্ছল ঝর্ণার সাবলীলতা অনুভব করলাম।

তাঁর গাড়ি অনুসরণ করে তাঁদের বাসার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। ছিমছাম ছোট্ট বাড়িটার মত বাড়ির নামটাও সুন্দর : কণিকা। সে কালের হাল ফ্যাশনের ধাঁচে ইংরেজিতে লেখা নামটা। ড্রয়িংরুমে ঢুকতেই একটা সাজানো-গোছানো সম্পন্ন সংসারের ছবি চোখে পড়ল। সারাটা বাড়ি জুড়ে একটা রুচি আর বৈদগ্ধ্যের অবারিত সৌরভ। দেখলেই বোঝা যায় অনেক যত্ন, পরিশ্রম আর মার্জিত বৈভব দিয়ে একটু একটু করে তৈরি এই নিটোল বাড়ির অনবদ্য তিলোত্তমা। কোথাও অবহেলা সতর্কতা বা বিচ্যুতির সামান্যতম চিহ্ন নেই। বাড়িটার দিকে তাকালেই বোঝা যায় এই বাড়ি যার রুচি আর পরিচর্যায় তৈরি তিনি একজন সুযোগ্য মানুষ, নিজের এবং চারপাশের সবার পুরোপুরি উপভোগের যোগ্য করে পৃথিবীকে গড়ে তোলার শক্তি যাঁর হাতে। অনুভব করলাম সে কালে প্রতিটা বাঙালি মেয়ে সুচিত্রা সেন হতে চেয়েছিল, কিন্তু কেন তখন একমাত্র তিনিই তা হয়েছিলেন। এটা কেবল রূপের ব্যাপার নয়। রূপ, রুচি, বৈদগ্ধ ব্যক্তিত্ব সব মিলে একটা বর্ণনাতীত ঘটনা।

চা শেষ করে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম। কিন্তু আসার আগে কথা দিয়ে আসতে হল পরের শুক্রবারে অনেকক্ষণ গল্প করার জন্যে আবার যেতে হবে, সেদিন পরিচয় হবে শরীফ সাহেবের সঙ্গে।

এরপর অনেকবার তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে, কখনো তাঁর বাসায়, কখনো বাইরে। কখনো মুহূর্তের জন্যে, কখনো দীর্ঘক্ষণের।

অবিশ্বাস্য জীবনমুখী ছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের চতুরঙ্গ উপন্যাসের দামিনীর মত ছিলেন তিনি, যে দামিনী "উত্তুরে হাওয়াকে সিকি পয়সা খাজনা দিবে না বলিয়া পণ করিয়া বসিয়া আছে।" প্রচুরভাবে, বিপুলভাবে, পর্যাপ্তভাবে বেঁচে থাকায় বিশ্বাস করতেন তিনি। তাঁকে দেখলেই মনে হত তাঁর সজীব দুই চোখ সরাসরি তাকিয়ে আছে জীবনের দিকে, যে জীবন উষ্ণ এবং জীবন্ত। তাঁর কাছে গেলে জীবনের ওপর আস্থা ফিরে আসত। হতাশার নদীতে জলোচ্ছ্বাসের শব্দ শোনা যেত। না, তিনি মৃত্যুকে চিনতেন না। চেনার আগ্রহও ছিল না তাঁর। তিনি চিনতেন উষ্ণ তপ্ত উপচানো পরিপূর্ণ জীবন। জীবনের শেষ দশ বছরে ক্যানসারের আক্রমণে তিলে তিলে ক্ষয়ে যাওয়া শরীর নিয়ে প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে তাঁর আপোষহীন গৌরবময় সংগ্রামে, এমনকি মৃত্যুর আগের মুহূর্তের বেঁচে থাকার নিঃশেষিত দিনগুলোতেও তাঁর এই প্রচণ্ড জীবনপিপাসা একইরকম অপরাজেয় ছিল। তিনি মৃত্যুর ভেতরে হেঁটে গেছেন মৃত্যুর সঙ্গে অপরিচিত অবস্থায়।

উনিশ শ আটষট্টির শেষের দিকে আমি একের পর এক ফিল্মে অভিনয় করার প্রস্তাব পেতে শুরু করি। এর আগেও দু-একটা প্রস্তাব পেয়েছিলাম, দ্বিধার কারণে এগোই নি। আমার শিক্ষক সত্তার সঙ্গে অভিনেতা সত্তার বিরোধজনিত স্বাভাবিক কারণেই এগোনো হয় নি। তাঁর সঙ্গে দেখা করে আমি এ ব্যাপারে তাঁর মতামত জানতে চেয়েছিলাম। তিনি অভিনেতার জীবন বেছে নেয়ার পক্ষে মত দিলেন। কেবল মত দিলেন না, অভিনেতা হিশেবে আমার যোগ্যতা এবং সম্ভাবনাগুলোকে এমন জীবন্ত আর রক্তিম করে আমার সামনে তুলে ধরলেন যে আমি তরুণ বয়সের যুবকদের মত উৎসাহী হয়ে উঠলাম। শেষ অব্দি ফিল্মে যাওয়া আমার হয় নি। শিক্ষকতার জন্যে আমার জন্মান্ধ আকুতিই তা হতে দেয় নি। আমার মনে হয়, না গিয়ে শেষ অব্দি ভালোই হয়েছিল। আমার ভেতরকার শিক্ষকের হৃদয়কে চেনা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমার ঐ হৃদয়টি ছিল তাঁর দৃষ্টির অনেক আড়ালে—আমার একান্ত ভেতরে। দূর থেকে আমার মঞ্চের মানুষটাকেই তাঁর তিনি চিনতেন। সে জায়গায় তিনি ভুল করেন নি। এই গুণগ্রাহিতা ছিল তাঁর মধ্যে। তাঁর আশে পাশের প্রতিটা মানুষের প্রতিটা সুপ্ত ও প্রকাশিত সব সম্ভাবনাকে তিনি টের পেতেন এবং অকুণ্ঠ সংবর্ধনা জানাতেন। তিনি নিজে ছিলেন তপ্ত হৃদয়ের অধিকারী, তাঁর কাছে আসা মানে ছিল জেগে-ওঠা। সেই জন্যে তিনি কখনো নিঃসঙ্গ ছিলেন না। আমাদের বয়সের সে সময়কার প্রাণবন্ত তরুণ-তরুণীরা তাঁকে বড় বোন হিশেবে, কনিষ্ঠেরা মা হিশেবে আমৃত্যু তাঁকে ঘিরে রেখেছে।

তাঁর কথাবার্তা ছিল প্রাণৈশ্বর্যে ভরা। পাগলা-ঝোরার মত উচ্ছল তীব্রতায় তা উৎসারিত হত। যতক্ষণ তাঁর ভেতরকার প্রকশের আকুতি পুরোপুরি শেষ না হত ততক্ষণ এই কথার আবেগ থেকে তাঁর মুক্তি ছিল না। তাঁর অনুভূতিশীল ভাষা-কথাময় উজ্জ্বল দুই চোখে তাঁর তীব্র সজীব চৈতন্যধারাকে উচ্ছ্বত হতে দেখা যেত।

৩.

তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের কয়েক বছরের মধ্যেই জীবনের ক্ষতির সঙ্গে তাঁকে পরিচিত হতে দেখি। পাকিস্তানী সৈন্যদের হাতে তাঁর সম্ভাবনাময় তরুণ মুক্তিযোদ্ধা সন্তানের মৃত্যু এবং ঐ মৃত্যুর পথ ধরে স্বামীর জীবনাবসান তাঁকে নিঃসঙ্গ করে ফেলে। যে কোনো মানুষেরই এমনি পরিস্থিতিতে ভেঙে পড়ার কথা। কিন্তু তিনি ভাঙেন নি। তাঁর প্রবল জীবনবাদ তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছে। তিনি বিষণ্ন হয়েছেন, কিন্তু বিমর্ষ হন নি। তাঁর যে তেজস্বিতাকে আমি একদিন ক্রোধ হিশেবে দেখেছিলাম, আজ দেশের প্রতিক্রিয়াশীল মৌলবাদীরা তার ধার অনুভব করছে।

উনসত্তর থেকে একাত্তুরে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্নই হয়ে গিয়েছিল। তাঁর দুই ছেলে, রুমী আর জামী, দুজনেই ছিল ঢাকা কলেজে আমার ছাত্র। সভা-সমিতিতে আমার সঙ্গে দেখা হলেই বলতেন, 'আমার ছেলেরা আপনার নাম বলতে অজ্ঞান। বাসায় আসবেন সময় করে।'

একাত্তর পর্যন্ত তাঁর বাসায় যাওয়া হয় নি। পরে তাঁর বাসায় যখন গেলাম, তখন বাড়ির সেই প্রথম দিনের রুচি এবং বৈভবের জগতে অবহেলার ছোঁয়া লেগেছে। চার সদস্যের মধ্যে দুজনই তখন আর নেই।

একাত্তর তাঁর স্বামী-সন্তানকে তাঁর কাছ থেকে নিয়ে গেছে, বিনিময়ে তাঁর ভেতর জাগিয়ে দিয়েছে একজন স্মরণীয় লেখিকাকে। তাঁর ভেতর একজন প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন লেখিকার শক্তি আগে থেকেই তৈরি হয়ে ছিল, একাত্তর তাঁকে লেখার বিষয়বস্তু দিয়েছে। যে নির্লিপ্ত ও আবেগময় বর্ণনায় তিনি একাত্তরের ঢাকাকে উজ্জ্বল করে রেখে গেছেন বাংলা সাহিত্যে তা স্মরণীয় হবে।

'একাত্তরের দিনগুলি' পড়া মানে একাত্তুরের ঢাকায় বেঁচে থাকা। কেবল ঢাকা নয় মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশে বেঁচে থাকা। এই বই পড়তে গিয়ে যতবার আমার চোখ অসহায়ভাবে অশ্রুসিক্ত হয়েছে, অব্যক্ত কষ্টে বুকের ভেতরটা পাথরের মত হয়ে গেছে আমার জীবনে আর কোনো বই পড়ে তেমনটা হয় নি। আমার ধারণা, বাংলাদেশে এই বইয়ের পাঠকমাত্রেই আমার সেই সিক্ত চোখকে একইভাবে অনুভব করবেন।

মুক্তিযুদ্ধের ওপর বাংলাদেশে এ যাবৎ যত বই লেখা হয়েছে, এ বইটি সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে মানবিক। কেবল আমাদের নয়, পৃথিবীর সাহিত্যে এমন বই বিরল। এ্যানা ফ্রাংকের ডায়রি এই বইয়ের প্রেরণা হিশেবে কাজ করে থাকতে পারে, কিন্তু আমার বিশ্বাস, এ্যানা ফ্রাংকের ডায়রির চেয়ে এই বই অনেক গভীর, ব্যাপ্ত, তলদেশবহুল। যুদ্ধধৃত দৈনন্দিন জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনার পাশাপাশি এই বইয়ের মধ্যে একটা গোটা জাতির রক্তাক্ত হৃদয়কে দেখা যায়। যে বেদনার ভেতর দিয়ে একদিন বাংলাদেশের উত্থান ঘটেছিল, যা আজ আমরা ভুলে গেছি, একজন বিপর্যস্ত গৃহবধূর করুণ জীবনের ভেতর সেই দেশ ও দুঃখ পুরোপুরি প্রতীকায়িত হয়ে রয়েছে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের মত এই বইটিও অনন্য। একাত্তরের দিনগুলি আগামী দিনের বাঙালি জাতির কাছে জীবন্ত মুক্তিযুদ্ধ হয়ে বেঁচে থাকবে।

আরেকবার তিনি জেগে ওঠেন পঞ্চান্ন বছরের দিকে—ক্যানসারে আক্রান্ত হবার পর। দরোজার পাশে নিশ্চিত মৃত্যু তাঁর সহজাত জীবনবাদিতাকে প্রায় দুর্জয় করে তোলে। যে

পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষ মৃত্যুর হাতে শর্তহীন আত্মসমর্পণ করে বসে, সেই পরিস্থিতিতে জীবনের অবশিষ্ট প্রতিটি মুহূর্তের ভেতর পরিপূর্ণভাবে বাঁচার জন্য তিনি মরিয়া হয়ে ওঠেন। তাঁর ক্যানসারের সঙ্গে বসবাস বইয়ে তাঁর অসাধারণ জীবনী-শক্তি দেখে অবাক হয়ে যেতে হয়। এমন শান্ত নির্লিপ্তভাবে তাঁর ক্যানসার হওয়ার ঘটনাগুলোকে গুছিয়ে এক এক করে তিনি একদিন বর্ণনা করেছিলেন যে তাঁর সেই নিষ্ঠুর নির্লিপ্ততা দেখে আমি প্রায় অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। কোথায় নীরব থাকলে মানুষের হৃদয় সবচেয়ে বেশি করে বেজে ওঠে, তা তিনি সহজাতভাবে জানতেন। একাত্তুরের দিনগুলিতে রুমীর চিরবিদায়, পীরের হঠকারিতা, শরীফ সাহেবের মৃত্যু এমনি নীরবতার ভেতর দিয়ে, ছোট্ট পরোক্ষ ইশারায় তুলে ধরা হয়েছে বলেই তা স্মৃতি থেকে হারায় না। স্বামী-সন্তান একাত্তরেই হারিয়েছিলেন তিনি। একমাত্র জীবিত সন্তান দেশান্তরিত। সামনে মৃত্যু। সব হারিয়ে তাঁর জীবনাগ্রহ সর্বগ্রাসী হয়ে ওঠে। একাত্তরে তাঁর মত সারা জাতির হারানো প্রিয় পরিজনদের অন্যায় হত্যার বিচারের দাবিকে এগিয়ে নেবার বিশ্রামহীন সংগ্রামে তিনি প্রদীপের মত জ্বলতে শুরু করেন।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে রাষ্ট্র হিশেবে পাকিস্তানের পতন ঘটে। কিন্তু জাতির হৃদয়ের ভেতরে যে পাকিস্তান বেঁচে ছিল, এরপর প্রয়োজন পড়ে সেই পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের। এই পাকিস্তানই আসল পাকিস্তান। তাই এই যুদ্ধ সর্বাত্মক। একাত্তরের রাজাকার-আলবদরদের উত্তরাধিকার থেকে জন্ম নেওয়া কট্টর বা কোমলপন্থী কোটি কোটি মানুষের এ এক বিশাল বাংলাদেশ। এই বাংলাদেশ বাস্তব। এই বাংলাদেশ আমাদের নিজেদের হৃদয়ে ও বাইরে। জাহানারা ইমাম এই যুদ্ধের অবিসংবাদী নায়িকা। এই নায়িকা পঞ্চাশের দশকের 'ঢাকার সুচিত্রা সেন' নন—কিংবা যাঁর মত তিনি হতে চাইতেন সেই কিংবদন্তীর নায়িকা সুচিত্রা সেনও নন—ঐ দুজনের চাইতেই তিনি বড়। জাহানারা ইমাম এই জাতির উদার নিরপেক্ষ প্রগতিশীলতার যাত্রার প্রথম ও প্রধান সাংস্কৃতিক নায়িকা।

সবশেষে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় কয়েক বছর আগে তাঁর বাড়িতে, তাঁর মুখের ক্যানসারের দ্বিতীয় অস্ত্রোপচারের পর। তখন তাঁর মুখের দিকে তাকানো যায় না। জিভ ঝুলে পড়েছে, ঠোঁট অস্বাভাবিক, মুখ ক্লিষ্ট, কথা জড়ানো। বুকের ভেতর একটা মূক কষ্ট টের পেলাম। তাঁর বিগত দিনের সেই অম্লান মুখশ্রী আমার চোখের চারপাশে হাজারো উজ্জ্বল ছবির মত ঘুরে বেড়াত লাগল—সেই নিষ্কৃতিহীন ছবির শোভাযাত্রা থামানো যায় না। আহা, এই সেই ঢাকা শহরের এককালের সুচিত্রা সেন, পঞ্চাশ দশকের আমাদের দেখা তিলোত্তমা।

তাঁর সঙ্গে ঘণ্টা দুই কথা হল। দেখা হতেই বললেন, 'দেখেছেন কেমন মা কালী হয়ে গেছি।' সহজ সাবলীলভাবে বললেন তিনি। হ্যাঁ, সত্যিই মা কালী। জিভ ঝুলে থাকা মা কালী। ছেলেবেলা থেকেই আমি স্নায়বিকভাবে দুর্বল। জীবনের পতনকে আমি সহ্য করতে পারি না। বার্ধক্য থেকে পালিয়ে তাই আমি চির-তারুণ্যের সহচর হয়ে থাকতে চাই। অতৃপ্ত হাতে কেবল জরা-মৃত্যু-নির্লিপ্ত জীবনকে খুঁজি। জীবনের দুই বিপরীত মেরুকে পাশাপাশি দেখার শক্তি আমার নেই। পরিণত মানসিকতার চূড়াকে স্পর্শ করা তাই আমার হল না। মৃত্যু দেখলে এক অশুভ আতঙ্ক আমার স্নায়ুতন্ত্রীকে অধিকার করে। অন্ধকার

দেখলে আমি ভয় পাই। সারা পৃথিবীতে তাই আমি কেবল দেখতে চাই আলো, সকালবেলার কচি, নরম উজ্জ্বল একচ্ছত্র আলো।

জাহনারা ইমামকে দেখার মুহূর্ত থেকে আমি ভেতরে ভেতরে অসুস্থ হয়ে পড়তে শুরু করি। বারে বারে আমার সামনের সেই মুখটাকে ভুলে থাকতে চাই। তাঁর কাছ থেকে পালিয়ে বাঁচার কথা মনে হতে থাকে। কেন দেখতে হল আমাকে এ দৃশ্য? কেন এতদিন বেঁচে থাকতে হল এর জন্য? এ দৃশ্য অন্যায়, অসহ্য, নির্বিবেক। মানুষের মর্যাদার পক্ষে অবমাননাকর! এই কি মানবজন্মের নিয়তি? কেন এমন হয়? বীণাপাণিকে কেন একদিন এভাবে ঝুলন্ত-জিহ্বা মা কালী হয়ে যেতে হয়।

অথচ কত সহজভাবে জাহানারা ইমাম জানালেন কথাটা! যেমন স্বতঃস্ফূর্তভাবে তিনি আমাকে রাস্তা থেকে বাসায় আমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন একদিন ঠিক তেমনি স্বচ্ছন্দ্যভাবে। যেন তাঁর নয়, অন্য কারো জীবনে ঘটেছে ঘটনাটা। যেন তাঁর অব্যাহত সুখের পৃথিবীতে কিছুই ঘটে নি কোথাও, ঘটে থাকলেও যা কিছু ঘটেছে সব তাঁর পরিচিত প্রত্যাশিত। এই নির্লিপ্ত পরিতৃপ্ত আনন্দোজ্জ্বল জীবন আমার ভেতরে কোথায়?

কিন্তু বীণাপাণিকে কেন একদিন এভাবে রক্ত-জিহ্বা কালী হয়ে যেতে হয়, 'বাণীরূপেণ সংস্থিতাকে' 'শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।' প্রত্যেক জাতির জীবনে একেকটা সময় আসে যখন তার বুদ্ধি বিবেক প্রজ্ঞা ধর্ম সব নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মপুত্রেরা অশুভের দর্পিত আস্ফালনকে অসহায়ের মত তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। তখন বীণাপাণিকে পদ্মাসন থেকে নেমে খড়্গধারিণী রণরঙ্গিনী মূর্তি হতে হয়। শারীরিক ও মানসিকভাবেই তা তিনি হয়েছিলেন। আমরা তরুণ বয়সে তাঁর বীণাপাণি রূপ দেখেছিলাম, পরিণত বয়সে তাঁর ভেতরকার বিবৃত রণরঙ্গিনী চণ্ডীকে।

৪

প্রথমদিন তাঁর সঙ্গে আমার যে তর্কের সূত্রপাত হয়েছিল জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তা অব্যাহত ছিল। তাঁর সঙ্গে আমার সামনাসামনি যত দেখা হয়েছে টেলিফোনে কথা হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি। কথা শুরু হতে না হতেই আমাদের বিরোধ বেধে যেত—তারপর সেই উষ্ণ তীব্র আনন্দ-মধুর বিতর্ক নিরন্তরভাবে এগিয়ে চলত। ঝগড়ায় ক্লান্ত হয়ে পড়লেই আমরা কেবল প্রসঙ্গে ছেদ টানার কথা ভাবতাম। ভিন্ন মতাবলম্বীদের প্রতি আমি চিরকালই শ্রদ্ধাশীল। যে আমার থেকে আলাদা ভাষায় কথা বলে সে আমার বন্ধুর অধিক বন্ধু। তাঁর উক্তি আমাকে আলোকিত করে। আমার চেতনায় নতুন রঙ ধরায়। আমার অসম্পূর্ণ অস্তিত্বকে অল্প হলেও পূর্ণতার দিকে এগিয়ে দেয়। নানান জাতের গাছ যেমন একটা উদ্যানকে সম্পন্নতা দেয়, নানারকম মতবাদ তেমনি, মানুষের চেতনাজগৎকে সমৃদ্ধ করে। এ মতবাদ সংখ্যায় যত বাড়বে তত ভালো। এজন্যে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ঘোষণাপত্রে আমরা বারবার জানিয়েছি, আমাদের শক্তিমান মত-পার্থক্যই আমাদের শক্তি। জাহানারা ইমামের সঙ্গে আমার যে অন্তহীন তার্কিকতা চলত তার কারণ এ নয় যে সিদ্ধান্তের জায়গায় আমরা খুব একটা আলাদা ছিলাম। অনেক সময় দেখা যেত ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমরা দুজনে ভিন্ন ভাষায় হয়ত একই কথা বলে চলেছি। আমাদের ভেতর যা আলাদা ছিল তা তাকাবার ভঙ্গি। তিনি আশাবাদীর চোখে

পৃথিবীকে দেখতেন, আমি বিষণ্ন দৃষ্টিতে। এই বিষণ্নতাকে তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না। তাঁর কাছে এ ছিল জীবনবিমুখতারই ছদ্মবেশ। একদিন তর্কের সময় তিনি আশাবাদ-নৈরাশ্যবাদের সেই ধ্রুপদী গল্পটা তুলেছিলেন। বলেছিলেন, ধরুন একটা গ্লাসের অর্ধেকটা পানিতে ভরা। আশাবাদী কী বলবেন? বলবেন, আধগ্লাস পানি আছে। নিরাশাবাদী বলবেন আধগ্লাস পানি নেই। সত্য কোনটা? কোনটা বড়? আমি বলেছিলাম সত্য হিশেবে বড় দুটোই। কিন্তু সত্য দেখলে এখানে চলবে না। আমাদের দেখতে হবে ঐ দুই সত্যদ্রষ্টাকে। যে বলবে আধগ্লাস পানি আছে, সে, আমার মতে, স্বপ্নহীন পাথুরে মানুষ। সে যতটুকু পেয়েছে, ততটুকুকেই সে কেবল চিনতে পারে। তাকে ছাড়িয়ে তার দৃষ্টি যায় না। কিন্তু নৈরাশ্যবাদী এদিক থেকে আশাবাদীর অধিক আশাবাদী। আধগ্লাস পানি নেই সে বলছে কেন? বলছে এ জন্যে যে তার স্বপ্ন ছিল পুরো গ্লাসের জন্যে, তাই আধগ্লাস পেয়ে সে আশাহত। এই মানুষ কল্পনাপরায়ণ, স্বপ্নচারী এবং অতৃপ্ত। তাঁর আত্মার ক্রন্দন গ্লাসের ঐ বাকি অর্ধেককে পূর্ণ করে তোলার আর্তিতে। এই নৈরাশ্য একটা বলিষ্ঠ ইতিবাচক ব্যাপার। একে ভেঙেপড়া ভাবলে ভুল হবে। জীবনকে আমরা ভালবাসি বলেই আমাদের ভেতর মৃত্যুবিষণ্নতা জাগে। এই বেদনাকে কি আমরা জীবনবিমুখতা বলতে পারি? নাকি এ জীবনের চেয়ে বড় জীবনের জন্য এক শক্তিমন্ত আকুতি? বিষণ্নতা, মানসিক ভারসাম্যের প্রয়োজনেই, আমাদের পরিপূর্ণ জীবন উপভোগের দিকে তাড়িয়ে নেয়। আমার ধারণা বিষণ্নতা এবং বিষণ্নতা-রোগকে একাকার করে গুলিয়ে ফেলা উচিত নয়।

সেই বিতর্কের পর্ব চিরদিনের মত শেষ হয়েছে। ঐ প্রদীপ আর জ্বলবে না।

আমার বাসা উত্তরায়, বিমান বন্দরের ওপারে। তাঁর মৃত্যুর দিনকয়েক পরে কাগজে দেখলাম জাহানারা ইমামের মরদেহ আমেরিকা থেকে ঐদিনই বিকেল চারটায় ঢাকা বিমান বন্দরে এসে পৌঁছবে। আমার যাবার আগ্রহ ছিল, শক্তি ছিল না। আগেই বলেছি মৃত্যুকে আমি সহ্য করতে পারি না। মৃতের মুখ দেখলে জীবনকে আমার অর্থহীন মনে হয়। আত্মীয়-বন্ধু-প্রিয়জনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াও আমি এড়িয়ে চলি। যে মানুষ একদিন আমাদের ভেতর নিঃশ্বাস নিয়েছে, সুখে দুঃখে দোসর হয়ে বেঁচেছে, প্রাণবন্ত হুল্লোড়ে আসর মাতিয়েছে, সে মানুষটা শক্ত নীরক্ত হয়ে টানটান শুয়ে আছে এই দৃশ্যে আমার কি প্রয়োজন? যদি তাঁর মৃত্যু হয়েই থাকে সে থাক আমার কাছে খবরের কাগজের হারিয়ে যাওয়া আর দশটা ভেদাভেদহীন নির্বিকার তথ্যের মত। আমার স্মৃতিতে সে বেঁচে থাক চির তারুণ্যময় উজ্জ্বল এক পৃথিবীর অম্লান বাসিন্দা হয়ে। তাঁর মৃত্যু দিয়ে আমি কী করব? এই মৃত্যু-চিহ্নিত পৃথিবীতে শেষ পর্যন্ত যে কথাটুকু সত্য তার নাম তো জীবন।

জাহানারা ইমামের মরদেহ আসার সময়টা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। বিকেলে কাজ পড়ায় শহরের উদ্দেশ্যে বেবিট্যাক্সিতে রওনা হয়েছি, বিমান বন্দরের সামনে অজস্র মানুষের সুবিপুল শোভাযাত্রার সামনে পড়তে হল—জাহানারা ইমামের কফিন ট্রাকে করে এলিফ্যান্ট রোডের সেই বাড়িটাতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। শোভাযাত্রায় অনেক পরিচিত বন্ধুদের মুখ দেখলাম। আমার বেবিট্যাক্সি জনতার একপাশ দিয়ে কোনোমতে জায়গা করে এগিয়ে চলেছে। মিছিলের সামনের দিকে জাহানারা ইমামের লাশবাহী ট্রাক। ট্রাকের পাশ দিয়ে যাবার সময় তাঁর কফিনটা চোখে পড়ল—কালো কাপড় দিয়ে ঢাকা—ওপরে অজস্র

ফুল আর ফুলের তোড়া। কফিনের পাশ দিয়ে যাবার সময় তাঁকে শেষ বিদায় জানালাম। কেবলি মনে হতে লাগল সেই উজ্জ্বল দুই চোখ, প্রতিভা আর দুর্বার জীবনবাদিতা কফিনের ভেতর এখন কী নির্বিকার, প্রত্যুত্তরহীন।

একটা ভারী কষ্ট গলা অব্দি উঠে এসে বুক চেপে বসে রইল। আমার চোখ ছাপিয়ে পানি টলমল করে উঠল, কিন্তু মাটিতে পড়ল না। আমরা এখন আর কাঁদি না। বয়সের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জেনেছি, যে দুঃখের অশ্রু একবার মাটিতে ঝরে, সে দুঃখকে আমরা হারিয়ে ফেলি।

১৬/৭/৯৪

## বিদায়, অবন্তী!

১

গ্রামের মেঠো রাস্তার উপর দিয়ে এগিয়ে চলেছে একটা টগবগে মিছিল—ঘামে জ্যাবজেবে গেঁয়ো মানুষের একটা বিরাট শোভাযাত্রা। মিছিলে অধিকাংশের পরনে লুঙ্গি—গা খালি, ঘাড়ের উপর গামছা, কদাচিৎ দুয়েকজনের গায়ে গেঞ্জি। দুয়েকজন পাজামা-পাঞ্জাবি পরা আধা-ভদ্র বা ভদ্র চেহারার মানুষও রয়েছে মিছিলটায়।

এটাকে মিছিল না বলে উদ্দীপ্ত গ্রামীণ মানুষদের একটা বিরাট অরাজক ধাবমান দলই বলা যায়। লোকগুলোর অধিকাংশই গ্রামের গৃহস্থ বা ক্ষেতচাষী—যাদের শরীরের কটু গন্ধ, রোদে পোড়া তামাটে রঙ এবং অমার্জিত কর্কশ হাত-পাগুলো বলে দেয় যে সুদূরকাল থেকে পুরুষানুক্রমিকভাবে এরা উদ্ভূত হয়ে এসেছে এই গ্রাম-বাংলার মাটির ভেতর থেকে, এর সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রাম করেছে এবং এর ভেতর দিয়েই টিকিয়ে রেখেছে নিজেদের প্রবহমান নৃতাত্ত্বিক ধারা।

মিছিলটা এগিয়ে চলছে উদ্দীপ্তভাবে। মানুষগুলোর চোখে স্বপ্ন, শিরায় শোণিতে উন্মাদনা—যেন এক সম্ভাব্য যুদ্ধ এবং তার নিশ্চিত বিজয়ের উদ্দীপনায় জেগে আছে সকলে। মিছিলের একেবারে সামনের দিকে কয়েকজন ভদ্র চেহারার প্রৌঢ় এবং যুবক। যুবকদের মধ্যে যে রয়েছে সবার সামনে তার চেহারা শপথে ও প্রতিজ্ঞায় দৃপ্ত এবং অনন্য-সাধারণ—সবার মধ্যে থেকে তাকে সহজেই আলাদা করে চোখে পড়ে। যুবকটির হাতে একটা দো-নলা বন্দুক, চলার ভঙ্গিতে সেনাপতিসুলভ নির্ভীকতার সুস্পষ্ট আভাস।

ধাবমান দলটির ভেতর থেকে মুহুর্মুহু ধ্বনি উঠছে, 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান,' 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ইত্যাদি। তাদের সেই মিলিত কণ্ঠের বলীয়ান আওয়াজ গ্রাম মাঠ প্রান্তরের ওপর দিয়ে সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ছে।

অনেক পথ ঘুরে মিছিলটা এসে পৌঁছল নদীর ধারে—হাটের মাঝখানে প্রাচীন বিশাল বটগাছটার তলায়। হাট লোকে লোকারণ্য। মিছিল এসে পড়ায় চারপাশ থেকে আরো অসংখ্য মানুষ হুড়মুড়িয়ে ঢুকে মিছিলটাকে যেন আরো প্রাণোচ্ছল আর উদ্দাম করে তুলল। মিছিলের গগনভেদী শ্লোগান মুহুর্মুহু ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগল হাটের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। উদ্দীপনার চরম মুহূর্তে মিছিলের সামনের সেই দৃপ্ত যুবক তার দোনলা বন্দুক আকাশের দিকে তাক করে পরপর দুটো গুলি ছুঁড়ল সশব্দে। উদ্দাম জয়োল্লাসে ফেটে পড়ল হাটের বিপুল জনসমুদ্র—যেন গুলির শব্দের সঙ্গে সঙ্গে শত্রু নিপাত করে প্রতিষ্ঠিত

হয়ে গেল পাকিস্তান।

সময়টা সম্ভবত ১৯৪৬ সালের অক্টোবর বা নভেম্বর মাস। ঘটনাস্থল—টাঙ্গাইল জেলার করটিয়া। প্রতিভাদীপ্ত বন্দুকধারী যুবকটি এই কলেজের অধ্যক্ষ এবং খ্যাতিমান সাহিত্যিক ইব্রাহীম খাঁর বড় ছেলে—আমরা তাঁকে তুলাভাই বলে ডাকতাম। তিনি তখন আলিগড়ের ছাত্র। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ব্রত নিয়ে যেসব উদ্দীপ্ত মুসলমান তরুণ তখন আলিগড় থেকে সারা উপমহাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল তিনি তাঁদের একজন। এর আগেই করটিয়ার জমিদারের সঙ্গে বেশ কিছু সুশিক্ষিত এবং সংস্কৃতিবান মুসলমান শিক্ষাবিদ একত্রিত হয়ে গেছেন করটিয়া কলেজকে 'বাংলার আলিগড়' হিসেবে গড়ে তোলার স্বপ্ন নিয়ে—আধুনিক ধ্যানধারণায় প্রাণিত প্রগতিশীল মুসলমানদের একটি শিক্ষাকেন্দ্র হিশেবে এর ভিত্তিকে সুদৃঢ় করতে। বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে ছাত্ররা তখন করটিয়ায় পড়তে আসছে। এই করটিয়াকে কেন্দ্র করে সে সময় কলেজের শিক্ষক আর তরুণ মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে পাকিস্তান আন্দোলনের যে উদ্দীপনা জেগেছে, তুলাভাই তখন তার অন্যতম প্রেরণা।

এতক্ষণ যে মিছিলের দৃশ্যটি আমি বর্ণনা করছিলাম, সেটি আমার জীবনের রাজনৈতিক ঘটনার প্রথম স্মৃতি।

তখন সারা পূর্ব বাঙলায় পাকিস্তান আন্দোলনের উদ্দীপনা দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়েছে। সুদূর গ্রামবাংলার মেঠো পথেও সেই একই উদ্দীপনার জোয়ার। বাংলার গ্রাম থেকে শহর, শহর থেকে গ্রাম সবখানেই তখন পাকিস্তান আন্দোলনের একই উত্তাল ঢেউ। আমরা তখন করটিয়ায় থাকি। আমার আব্বা কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক। আমার বয়স ছয় কি সাত। সেদিন পাকিস্তান আন্দোলনের সংগ্রাম কীভাবে প্রতিদিন একটু একটু করে নিঃশব্দে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ছিল সেই ইতিহাস আমার মত একটা ছোট্ট শিশুর জানার কথা নয়—মিছিলের ঐ ছোট্ট উদ্দীপিত দৃশ্যটিই আজ আমার একমাত্র স্মৃতির সম্বল। আমি সব সময়ই বয়সের তুলনায় কিছুটা অপরিণত। আমি লক্ষ্য করেছি আমার সমবয়সী বন্ধুরা বিশ বছর বয়সে যেসব জান্তব রোমশ নিয়ে নির্বিকাবে আলাপ করত সেসব নিয়ে ভাবতে গেলে আমার চল্লিশ বৎসর বয়সেও কান লাল হয়ে উঠত। সেই সময় পাকিস্তান আন্দোলন নিয়ে সবখানে যে তোলপাড় চলছিল আমার মতন একজন ছ'সাত বছরের শিশুর মনে তা কমবেশি রেখাপাত করার কথা। সন্দেহ নেই যে আমার বয়সের অনেক ছেলেমেয়ের মনেই হয়ত সেসব অনেক ঘটনাই স্পষ্টভাবে এখনো জেগে আছে। কিন্তু আমার মনে ঐ একটিমাত্র দৃশ্য ছাড়া আর একটি স্মৃতিও বেঁচে নেই। আমার শৈশব ছিল দস্যিপনায় ভরা এবং দুরন্ত। সারাদিন অন্যের গাছ থেকে আম, ডাব, তেঁতুল চুরি করে খাওয়া, পুকুরে সাঁতরে বেড়ান, পাখির বাসা থেকে ডিম চুরির পৈশাচিক মুহূর্তগুলোর আড়াল দিয়ে যুগের এইসব বিরাট বিরাট ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো কখন নিঃশব্দে যে পার হয়ে গেছে জানতে পারি নি।

২

এর পরের যে রাজনৈতিক ঘটনা আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে সেটা ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্টের ছবি : পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস। ততদিনে আমার আব্বা করটিয়া থেকে জামালপুরে বদলি হয়ে অধ্যক্ষ হিশেবে জামালপুর আশেক মাহমুদ কলেজের প্রতিষ্ঠা

করেছেন। স্বাধীনতা দিবসের ছবিটি আজও জ্বলজ্বল করছে আমার চোখের সামনে। সারা শহর আনন্দে উদ্দীপনায় উদ্বেলিত, মুখরিত। আমার পরনে ততদিনে পাজামার উপর শেরোয়ানী চেপেছে, মাথায় জিন্নাহ ক্যাপ। অফুরন্ত উৎসাহে দল বেঁধে সারা শহর ঘুরে বেড়াচ্ছি আমরা, যদিও কেন এই আনন্দ তা খুব স্পষ্টভাবে জানা নেই। কিন্তু মনে আছে আমার শরীরের প্রাণকোষে প্রাণকোষে একটা নতুন জাতির জন্মের আনন্দ আর স্বাধীনতার উন্মাদনা ঝলমল করেছিল। কিছুক্ষণ আগে বয়সের তুলনায় আমার অপরিণতির কথা উল্লেখ করেছি। কিন্তু সেটা যে কতখানি হাস্যকর পর্যায়ের তা ঐ স্বাধীনতা দিবসের একটা ছোট্ট গল্প বলে বোঝানোর চেষ্টা করি।

ব্রহ্মপুত্র নদীর পাশের শুরকি বিছানো লাল রাস্তা দিয়ে আমরা হেঁটে যাচ্ছিলাম, আমার সাথে ছিল জাভেদ। জাভেদের বয়স তখন সতের আঠার, ছেলেবেলায় আমাদের বাসায় সেই যে কাজ করতে এসেছিল, তখনো সেই চাকরিতেই রয়েছে। হঠাৎ একখানে দেখলাম নদীর ভেতর জেলেরা মাছ ধরার জন্য সার বেঁধে যে সব খুঁটি পুঁতে রেখেছে পানির ওপর সেগুলোর জাগানো মাথা স্রোতের বেগে প্রচণ্ডভাবে এপাশ ওপাশ নড়ছে। ব্যাপারটা আমার কাছে অবাক আর রহস্যময় মনে হল, আমি বুঝে উঠতে পারলাম না কি কারণে বাঁশের মাথাগুলো পানি থেকে মাথা জাগিয়ে এভাবে ক্রমাগতভাবে নড়ে যেতে পারে। একসময় বিস্ময়ের শেষ প্রান্তে পৌঁছে জাভেদকে জিজ্ঞেস করলাম, এগুলো কী? জাভেদ রহস্যময় হাসি হেসে জবাব দিল, 'ঘোড়ার ডিম'। এর আগে ঘোড়ার ডিম নামের রহস্যময় জিনিসটার কথা অনেকের মুখেই শুনেছি, কখনো দেখি নি। কাজেই ঐ জিনিশটা সম্বন্ধে আমার মনে এমনিতেই একটা কৌতূহল অনেকদিন থেকেই সক্রিয় ছিল। জাভেদের রহস্যময় হাসির ভেতর এমন কিছু ছিল, যা দেখে আমি সঙ্গে সঙ্গে এগুলোকেই ঘোড়ার ডিম বলে বিশ্বাস করে ফেললাম। শুনে কে কতটুকু কৌতুকবোধ করবেন জানিনা কিন্তু আমি সত্যি সত্যিই বলছি বাঁশের খুটিগুলোর ঐ উদ্দাম রহস্যজনক নড়াচড়াকে আমি সেদিন থেকে ঘোড়ার ডিম বলে শুধু বিশ্বাস করেছিলাম তাই নয়, আমার এগার বারো বছর বয়স পর্যন্ত ওটাকে আমি ঘোড়ার ডিম বলেই জানতাম। এই ছিল আমার আট বছর বয়সের মানসিক পরিণতির নমুনা।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এই উপমহাদেশের হিন্দু-মুসলমানদের জন্য এক বিরাট আনন্দ ও দুঃখের ব্যাপার হয়ে দেখা দিল। পাকিস্তানের মুসলমান আর ভারতের হিন্দুরা স্বাধীনতার আনন্দ-উৎসবে ফেটে পড়ল। কিন্তু একই রকম নিরাপত্তাহীনতা ও অনিশ্চিত ভবিষ্যতের অন্ধকারে তলিয়ে গেল পাকিস্তানের হিন্দু ও ভারতের মুসলমানদের জীবন। এখনও ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্টের দিকে যখন ফিরে তাকাই তখন মনে হয় আমরা পাকিস্তানের মুসলমানরা সেদিন যখন স্বাধীনতা উদযাপনের উৎসবে, জয়োল্লাসে মত্ত ছিলাম ঠিক সেই সময়ে আমাদেরই পাড়ায় প্রতিবেশী হিন্দু বাড়ির হাট করে দেয়া দরজার আড়ালে মূহ্যমান একদল অসহায় বিমর্ষ মানুষ বাক্যহীন হয়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশংকায় নেতিয়ে গিয়েছিল। একই ঘটনা ঘটেছিল ভারতের প্রায় প্রতিটি ব্যথিত নির্বাক মুসলমান পরিবারের মানুষদের জীবনে। মাওলানা আবুল কালাম আজাদ তাঁর 'ইণ্ডিয়া উইন্‌স্ ফ্রিডম' বইয়ে লিখেছেন : ভারতের স্বাধীনতার পর তিনি খানিকটা বিস্ময়ের সঙ্গে টের পেয়েছিলেন যে ভারতের প্রায় অধিকাংশ মুসলমানই সে-সময় এমন একটি অদ্ভুত

ধারণা পোষণ করতেন যে ভারতের ছোট বা বড় যে-সব অঞ্চল মুলসমান-প্রধান সেগুলো পাকিস্তানের আওতাভুক্ত হবে, আর হিন্দুপ্রধান অঞ্চলগুলো ভারতের । আমার ধারণা ভারতবর্ষের হিন্দুরাও এ ধরনের একটা অদ্ভুত ভাবনায় ভুগত। (সাম্প্রতিককালের 'স্বাধীন বঙ্গভূমি' প্রতিষ্ঠার স্বপ্নের মধ্যে অতীতের সেই ধারণাটিরই সম্প্রসারণ চলছে কি?)

আমার মনে হয় বঙ্গদেশ মুসলমান প্রধান এলাকা বলে কলকাতার মুসলমানদের অনেকে ভেবেছিল যে বঙ্গদেশ সঙ্গতভাবেই পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং কলকাতা হবে তার রাজধানী। কলকাতার মুসলমান-প্রধান পার্ক সার্কাসের মুসলমানদের মধ্যে এই ধারণা ছিল প্রবল। পার্ক সার্কাসকে তারা কলকাতার পাকিস্তান বলে মনে করত। এখানকার প্রায় প্রত্যেক বাড়ির বাসিন্দারাই এই সময় পাকিস্তানের পতাকা তৈরি করে রেখেছিলেন হয়ত এই ভেবে যে, স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা ঐ পতাকা নিজ নিজ বাড়ির ওপর ওড়াতে পারবেন। কিন্তু তাঁদের এই স্বপ্ন সফল হয় নি।

আমার জন্ম এই পার্ক সার্কাস এলাকাতে, আমার নানার বাড়িতে। ১৯৪৮ সালে নানার বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে আমি সেখানে পাকিস্তানের বিষণ্ন অবহেলিত পতাকাকে লাঠিতে জড়ানো অবস্থায় ঘরের এক কোণে পড়ে থাকতে দেখেছি। সেই সঙ্গে দেখেছি বাড়ির বাসিন্দাদের লুকিয়ে লুকিয়ে কলের গানে তখনও আব্বাসউদ্দিনের সুরেলা কণ্ঠের উদ্দীপ্ত সেই গান শোনার আকুতি :

*সকল দেশের চেয়ে পেয়ারা দুনিয়াতে ভাই সে কোন স্থান।*
*পাকিস্তান, সে পাকিস্তান, সে পাকিস্তান, সে পাকিস্তান।*
*পাকিস্তানে রোজ বিহানে আজান দেয় বুলবুল*
*হিম শিশিরে অজু করে নামাজ পড়ে সব ফুল।*

* * *

*দুনিয়াতে আজ জুলমত ভারি নাই কো ইজ্জত নাই ঈমান*
*কে শোনাবে প্রেমের বাণী করবে কে মুশকিল আসান*
*এক কথায় তার সাফ জবাব দাও!—পাকিস্তান সে পাকিস্তান।*

জানি না ঐ বাড়ির কোন কোনো বাসিন্দার মনে তখনো এমন অলীক দুরাশা কাজ করছিল কিনা যে হয়ত কোন অসম্ভব সুদূর ভবিষ্যতে কলকাতা আবার পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং সেদিন এই গচ্ছিত পতাকা আবার কলকাতার সুনীল আকাশে মুসলমানদের আশার প্রতীক হয়ে সগর্বে উত্তোলিত হবে। ভারতের মুসলমান এবং পাকিস্তানের হিন্দুদের এইসব অলীক দুঃস্বপ্ন থেকে মুক্তি পেতে সুদীর্ঘ সময় লেগেছিল।

৩

আমার ধারণা, আমার আগের প্রজন্মের বাঙালি মুসলমানেরা প্রায় সবাই কমবেশি সাম্প্রদায়িক ছিল। অবশ্য কথাটাকে সরাসরি এভাবে না বলে 'তাঁরা ধীরে ধীরে একসময় সাম্প্রদায়িক হয়ে উঠতে বাধ্য হয়েছিল' এভাবে বললেই হয়ত তা সত্যের আরও কাছাকাছি হয়। এদের মধ্যে যারা পুরোপুরি সাম্প্রদায়িক ছিল না হিন্দুদের ব্যাপারে তাঁদেরও মনের গভীরে একটা প্রচ্ছন্ন অভিমান এবং বেদনাবোধ কাজ করত। হিন্দুদের

কাছ থেকে তাঁরা যে অনুদারতা এবং বৈষম্যমূলক আচরণ এই সময় পেয়েছিল তা তাঁদের অনেকেরই হৃদয় ভেঙে দিয়েছিল। 'বিশুদ্ধ অসাম্প্রদায়িক মুসলমান' সেকালে প্রায় বিলুপ্তই হয়ে গিয়েছিল বলা যায়। হিন্দুদের প্রতি অনাস্থা, অবিশ্বাস, ক্ষোভ, আক্রোশ, সহিংসতা, উন্মত্ততা বা নৈরাশ্য একেকজন মুসলমানের মধ্যে এক এক মাত্রায় কাজ করত। হিন্দুদের ব্যাপারে তাঁদের ভেতরে একটা ভয় ঢুকে গিয়েছিল। মুসলমানদের বাঁচতে হলে হিন্দুদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়েই যে টিকে থাকতে হবে সে-সময়কার মুসলমানদের মধ্যে এই ধারণাটা প্রায় বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। হিন্দুদের প্রতি বিরুদ্ধতাকে তাঁরা মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষার একটা আবশ্যিক শর্ত বলে মনে করত।

কিন্তু হিন্দু-বিদ্বেষের মতন এমন একটা দরকারি ব্যাপারকে আমাদের প্রজন্মের মূঢ় যুবকেরা যে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে দেখছে না জন্যে তাঁরা আমাদের জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত ছিল। আমাদের এক প্রজন্মে আগের অনেককেই দুঃখের সঙ্গে বহুবার একই বিলাপ করতে শুনেছি : "হিন্দুদের আসল চেহারা তো দেখ নি, দেখলে বুঝতে কী চিজ এরা। তোমাদের কি? পাকিস্তান পেতে তো কষ্ট হয় নি! চালাও, যত পার ফূর্তি চালিয়ে যাও এখন।"

আমার ধারণা, পরিবারের ছোট্ট, তুচ্ছ কোন্দল-কলহ থেকে শুরু করে জাতীয় বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিরাট বিরাট বিরোধের পেছনে পারিপার্শ্বিক বাস্তবতার অবদান যতখানি, মানুষের নির্বুদ্ধিতার অবদান তার চেয়ে কম নয়। সাদামাটা বুদ্ধির মানুষ খুব তাড়াতাড়ি সরলীকরণে পৌঁছে যেতে ভালবাসে। যেমন একজন মুসলমান খারাপ, দু'জন মুসলমান খারাপ—ব্যাস এর পরে আর কোন অনুসন্ধান, পর্যবেক্ষণ বা নিরীক্ষণ নেই, কোন তত্ত্বতালাশের মাথাব্যথা নেই—সোজা সিদ্ধান্ত হয়ে গেল: 'সব মুসলমান খারাপ।' সংখ্যাতাত্ত্বিকভাবে দুইয়ের পরে তিন বলে যে একটা সংখ্যা আছে, তিনের পরে চার—"সব মুসলমান" কথাটার আগে যে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মুসলমানের সুবিপুল পৃথিবী রয়ে গেছে—তাদের প্রত্যেকের ভালো-মন্দত্বের যে চুলচেরা বিচার বিশ্লেষণ বা মূল্যায়নের দরকার রয়ে গেছে—তার জন্য প্রয়োজনীয় ধৈর্য, সময় বা মেধার ক্ষমতা নেই এই ভেদাভেদরহিত মানুষগুলোর। ঠিক একইভাবে একটা হিন্দু খারাপ, দুটো হিন্দু খারাপ থেকে এক লাফে 'সব হিন্দু খারাপ' সিদ্ধান্তটি এক মুহূর্তেই এসে পড়ে। এমনিই ঘটে থাকে সবসময়। পৃথিবীর অনেক নির্বোধ ঘটনার মতই সাম্প্রদায়িকতা ব্যাপারটাও এমনি এক ধরনের অতি সরল ও ঝটিতি সরলীকরণের ফল। এই সাধারণীকরণ যে সব সময় নিরেট বুদ্ধির বোকা মানুষের নির্বুদ্ধিতারই অবদান তা নয়, অনেক সময় অনেক আলোকিত মানুষও আবেগোন্মত্ত পর্যায়ে এই সহজ সরলীকরণের শিকার হয়ে পড়।

প্রজন্মের পর প্রজন্মের ভেতর দিয়ে ভারতবর্ষের হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে যে তিক্ততা ও আক্রোশ জমে উঠেছিল সেই সহিংসতাই ঝকঝকে তলোয়ারের মত ঝলসে উঠে ১৯৪৭ সালে এক কোপে ভারতের মানচিত্রকে দুটুকরো করে দিয়েছিল। ভারত বিভাগের মাত্র পনের বছর আগেও ব্যাপারটা প্রায় সবার কাছেই অকল্পনীয় ছিল। বড় মাপের মানুষ থেকে সাধারণ মানুষ—কি হিন্দু কি মুসলমান—তখনও অখণ্ড ভারতবর্ষেরই স্বপ্ন দেখতেন। হাজার হাজার বছর ধরে এই বিশাল ভূখণ্ড একটা অখণ্ড রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি নিয়ে তখনও সবার সামনে দণ্ডায়মান। রাষ্ট্রীয় স্বপ্নের সেই বৈভবময় ভাবমূর্তিটি ভেতরে ভেতরে

ঘুনে ধরে যে এতখানি ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল এবং এত সহজে এমন ঠুনকো একটা আঘাতে তা যে এভাবে খানখান হয়ে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে পারে, ঘটনাটা ঘটার সামান্য কিছুদিন আগে পর্যন্ত তা বহু মানুষের কাছে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য ছিল। ভারত-বিভক্তির প্রথম সারির প্রবক্তাদের মধ্যেও এমন মানুষ অল্পই ছিলেন ভারতের এই দ্বিখণ্ডিত চেহারা যাদের হৃদয়কে ব্যথা-ভারাক্রান্ত করে নি। তবু ঘটেছে ঘটনাটা। ভারত বিভক্ত হয়েছে। নিষ্ঠুর বাস্তবের অমোঘ নির্দেশেই হয়েছে। ধর্মের ভিত্তিতে ভারতবর্ষের বিভক্ত হবার ভেতর প্রতিক্রিয়াশীলতার বিজয় লক্ষ্য করে অনেকে সেদিন বেদনা অনুভব করেছিলেন, কিন্তু আমার বিশ্বাস দেশ বিভাগই ছিল সেদিনকার ভারতের ইতিহাসের সবচেয়ে প্রগতিশীল ঘটনা। সেদিনের সেই ধর্মোন্মত্ত সহিংস পরিস্থিতির এর চেয়ে আর কোনো উন্নত ও মানবিক সমাধান বের করা সম্ভব ছিল সেদিন? ভারত বিভাগ না হলে হিন্দুদের বা মুসলমানদের স্বার্থ কতখানি লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত হত সে আলোচনায় না গিয়েও এটা স্পষ্ট বোঝা যায় যে সেদিন ভারত বিভাগ না হলে ভারতবর্ষের প্রতিটা হিন্দুপ্রধান এলাকায় মুসলমানের, এবং প্রতিটা মুসলমান প্রধান এলাকায় হিন্দুর রক্তের যে বীভৎস বন্যা বইত এযাবৎকালের মানব সভ্যতার ইতিহাসে তা হত ভ্রাতৃহননের ভয়াবহতম ঘটনা। আমার ধারণা, মুসলমান-প্রধান এলাকার প্রত্যেকটা হিন্দু এবং হিন্দু-প্রধান এলাকার প্রতিটা মুসলমান এই অভাবনীয় তাণ্ডবে এমন নারকীয়ভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত যে আজকের মত ভারতীয় উপমহাদেশ সহাবস্থান-প্রত্যাশী দু'টো মিশ্র জাতি অধ্যুষিত এলাকা না হয়ে হিন্দু ও মুসলমানে বিভক্ত দুটো নির্ভেজাল আলাদা অঞ্চলে পরিণত হত।

ভারত বিভাগ এই সাম্প্রদায়িক নিধনকে পুরোপুরি বন্ধ করতে পেরেছে এটা এককথায় হয়ত বলা যাবে না। দেশবিভাগের পর ভারত এবং পাকিস্তানে ছোট বড় দাঙ্গাহাঙ্গামা বিরতিহীনভাবে ঘটেই চলেছে। পাকিস্তানে হিন্দুদের সংখ্যা কম হওয়ায় এবং বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমানের মৌলিক স্বার্থের সংঘাত কমে যাওয়ায় এই দুই দেশে দাঙ্গার তীব্রতা কমতে কমতে প্রায় শূন্যের কোঠায় এসে ঠেকেছে। কিন্তু ভারতে তিনশ বছরের দাঙ্গার ঐতিহ্য আজো প্রায় একই ধারায় বহমান। এসব দাঙ্গায় নিহত সর্বস্বান্ত মানুষের সংখ্যাও খুব কম নয়। কিন্তু ভারতবিভাগ না হলে এই উপমহাদেশ যে অচিন্ত্য গণ-নিধন প্রত্যক্ষ করত সে কথা ভাবলে বোঝা যায় দেশবিভাগের মাধ্যমে কত স্বল্প মূল্যে কত অভাবনীয় একটা সৌভাগ্য আমরা সেদিন ক্রয় করেছিলাম। ভারত-বিভাগের পর ভারতের মত পাকিস্তানেও সংখ্যালঘুরা এতদিনের পরাক্রান্ত প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রবল ভূমিকা থেকে ক্রমে সরে গিয়ে নিজেদের ভাগ্যহীনতার বেদনার ভেতর ধীরে ধীরে ঝিমিয়ে যেতে শুরু করে এবং সাম্প্রদায়িক উগ্রতা, প্রকৃতির নিয়মেই, দুর্বল হয়ে এসে শান্তির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে শুরু করে দেয়।

৪

আমাদের আগের প্রজন্মের মুসলমানেরা ধীরে ধীরে কেন যে সাম্প্রদায়িক হয়ে পড়েছিল তার কারণ আন্দাজ করা কঠিন নয়। ব্যাপারটা নিয়ে অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীর সঙ্গে একবার আমার দীর্ঘক্ষণ আলাপ হয়েছিল। তিনি আমাকে তাঁর পরের প্রজন্মের এবং আমি

তাঁকে আমার আগের প্রজন্মের মানুষ হিশেবে ধরে নিয়েই কথা বলে চলেছিলাম। আমি তাঁকে বলেছিলাম, "আপনার প্রজন্মের মানুষেরা যে কমবেশি সাম্প্রদায়িক হয়ে উঠতে বাধ্য হয়েছিলেন তার কারণ হিন্দুদের আপনারা দেখে এসেছিলেন এক পরাক্রান্ত ও অত্যাচারী প্রতিপক্ষ হিশেবে। হিন্দুদের হাতে আপনারা শোষিত, নিগৃহীত হয়েছিলেন। বাংলাদেশের হিন্দু জমিদার ও হিন্দু কায়েমী স্বার্থের নিষ্পেষণে সাধারণ মুসলমানের সাংস্কৃতিক ও মানবিক মর্যাদাকে আপনারা ধুলায় অপমানে গুঁড়িয়ে যেতে দেখেছেন। আপনাদের প্রজন্মের উঠতি মুসলমানেরা হিন্দুদের দেখেছেন তাঁদের উন্নতির ও সমৃদ্ধির পথে প্রধান প্রতিবন্ধক হিশেবে। দেখেছেন : হিন্দুরা অজ্ঞাত কারণে আপনাদের গলা টিপে ধরতে চায়, আপনাদের শ্বাসরুদ্ধ করে মেরে ফেলতে চায়। এমন পরিস্থিতিতে আপনাদের পক্ষে একসময় সাম্প্রদায়িক হয়ে ওঠাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের প্রজন্মের তরুণেরা 'সাম্প্রদায়িক' হতে যাবে কেন? আমাদের প্রজন্ম শুরু হতে না হতেই প্রেক্ষাপট পুরোপুরি পাল্টে গেছে। ভারত-বিভাগ উপমহাদেশের হিন্দু ও মুসলমানের অবস্থানকে একটা সম্পূর্ণ নতুন ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। আমাদের সামনে যে হিন্দুকে আমরা দেখেছি সে হিন্দু কোন অত্যাচারী শক্তিমান প্রতিপক্ষ নয় ; হিন্দুদের আমরা দেখেছি মৃত্যুভয়ে পলায়নপর একদল নিঃস্ব নিরস্ত্র মানুষ হিশেবে—যাদের দিকে সহিংসতার পরিবর্তে মমতাস্নিগ্ধ সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দেয়াই মানুষ হিশেবে সেই মুহূর্তে ছিল আমাদের প্রথম কর্তব্য ; এবং আমরা তা করেছি। রক্তাক্ত সংঘর্ষকে আমরা ভ্রাতৃত্বের অশ্রুজলে রুপোলি করে তুলেছি। সাম্প্রদায়িকতা এখন বাংলাদেশ থেকে মোটামুটিভাবে 'নির্বাসিত'ই বলা যেতে পারে।

হিন্দুদের প্রতি বিদ্বেষের ব্যাপারে আমাদের প্রজন্মের উদাসীনতা আমাদের আগের প্রজন্মের মুসলমানদের উৎকণ্ঠিত করে তুলেছে এবং তাঁরা এতে একধরনের আশাভঙ্গের বেদনাই অনুভব করেছে। এবং এই নির্বুদ্ধিতার খেসারত হিশেবে আমাদের প্রজন্মকে অচিরেই যে হিন্দুদের দাসত্বের শেকলে আটকা পড়ে আবার তাদের গোলাম হয়ে যেতে হবে এই অভাবনীয় দুঃস্বপ্ন দেখতে দেখতে পৃথিবী থেকে তাঁরা বিদায় নিয়েছে। উনিশ শ একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তাঁদের এই উৎকণ্ঠা সবচেয়ে প্রকট রূপ নিয়েছিল।

প্রতিটি প্রজন্মের মানুষই, কোন্ অদ্ভুত কারণে জানি না, প্রায় ব্যতিক্রমহীনভাবে ধরে নেয় যে তাঁদের পরের প্রজন্মের মানুষেরা শক্তির দিক থেকে তাঁদের চেয়ে দুর্বল ও অসহায় হয়ে জন্মায়। যে বিরুদ্ধ পৃথিবীর সঙ্গে নিষ্ঠুর সংগ্রাম করে তাঁরা ধীরে ধীরে জীবনের জয়কে প্রতিষ্ঠিত করে নিতে পেরেছে, তাঁরা বিশ্বাস করতে ভালোবাসেন, তাঁদের পরের প্রজন্মের মধ্যে সংগ্রামের সেই দুর্দম শক্তি অনুপস্থিত। তাঁদের পরের প্রজন্মের মানুষেরাও যে নিজেদের যুগের বৈরী পরিবেশের সঙ্গে তাদের মত একইরকম সহিংস সংগ্রাম চালিয়ে জীবনের অগ্রযাত্রাকে সমুন্নত রাখতে সমর্থ, ব্যাপারটাকে তাঁরা পুরোপুরি যেন বিশ্বাস করতে পারে না। প্রাণীজগতের ভেতর নিজস্ব প্রজাতি-রক্ষার ব্যাপারে যে একটা নিদ্রাহীন উৎকণ্ঠা রয়েছে হয়ত এটা তারই ফলশ্রুতি। (মানুষের পৃথিবীতে এরই নাম হয়ত 'বাৎসল্য') যে অসহায় শিশুকে একদিন প্রতিমুহূর্তের নিরাপত্তা, পরিচর্যা ও যত্ন দিয়ে লালন করতে হয়েছে তাকে হঠাৎ করেই একজন পরাক্রান্ত মানুষ হিশেবে বিশ্বাস করার ব্যাপারে আশংকা অনুভব করাটাই মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। এজন্যেই প্রত্যেক প্রজন্মের

মানুষ, তাদের সাধ্যমত সামর্থ ও শক্তি দিয়ে পরের প্রজন্মক্রমের নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার দিকে ফিরে ফিরে তাঁদের সমর্থ হাত বাড়িয়ে দিতে চায়। আমাদের আগের প্রজন্মও আমাদের দিকে তাঁদের মমতাস্নিগ্ধ উৎকণ্ঠার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং শিউরে উঠেছিলেন এই ভেবে যে আমাদেরই সুখ ও সমৃদ্ধির জন্যে তাঁদের বিপুল কষ্ট ও তিতিক্ষায় অর্জিত পাকিস্তান আমাদের অবিমৃষ্যকারিতার জন্যেই হয়ত একদিন ব্যর্থ হয়ে যাবে এবং পরিণতিতে আমাদের অপরিসীম দুর্দশার কারণ ঘটাবে। তাঁরা আমাদের কালের রাষ্ট্রীয় বাস্তবতার পরিবর্তিত প্রেক্ষাপট ও সেই নতুন বাস্তবতার ভেতর থেকে জাগ্রত আমাদের প্রজন্মের অগ্রযাত্রার ক্ষুরধার প্রকৃতিটিকে বুঝতে ভুল করেছিল।

৫

ভারত বিভাগের পর পরই আরম্ভ হল হিন্দুদের অবিশ্বাস্য সংখ্যায় দেশত্যাগ। প্রথমে এক আধ বছর কিছুই বোঝা গেল না—মনে হল গোলমাল মিটে গিয়ে সব বৃষ্টিধোয়া আকাশের মত স্নিগ্ধ হয়ে গেছে। পরম নিশ্চিন্ত ভাব নিয়ে আমাদের সঙ্গে মিশতে লাগল আমাদের হিন্দু বন্ধুরা—এমনকি তাদের বাবা-মা, ভাই-বোন সবাই। যেন ব্যথিত হবার মত কোন কিছু আদৌ কোথাও ঘটে নি। আপাতদৃষ্টে মনে হল এই ধরনের দেশ বিভাগের কথা তারা যেন আগে থেকেই জানত এবং সহজভাবে তা মেনেও নিয়েছে। মাঝখানের দুই সম্প্রদায়ের মূঢ় এবং প্রগলভ কিছু মানুষের অবিমৃষ্যকারিতার জন্যে যে সাময়িক তিক্ততা এবং সহিংসতা নেমে এসেছিল কিছুদিনের জন্য এক লহমায় তা কেটে গিয়ে যেন এক দুর্ভাবনাহীন শান্ত সৌহার্দপূর্ণ পৃথিবী ফিরে এসেছে। যেসব হিন্দুরা রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় ছিল এতকাল, এমনকি কংগ্রেসের জঙ্গী সদস্য ছিল, তাঁরাও রাতারাতি কেমন যেন ভালো মানুষ হয়ে গেল। তখন বুঝতে পারি নি, একটু বড় হয়ে বুঝেছিলাম, বাইরের এই শান্ত নিরুদ্বিগ্ন প্রসন্ন চেহারা ছিল এই দেশের মানুষেরই একটা বিরাট অংশের নীরব মৃত্যুবরণের বেদনাময় চিত্র। সারা দেশে এই মৃত্যু ঘটেছিল প্রায় প্রতিটা পরিবারে, প্রতিটা চাতালের নিচে, প্রায় প্রতিটা হিন্দুর নিভে যাওয়া আনন্দোজ্জ্বল মুখের পোড়ো ভিটেয়।

আমাদের গ্রামের বাড়ি বাগেরহাট জেলার সুদূর গ্রামাঞ্চলে। এলাকাটা মুসলমান প্রধান, কিন্তু কাছাকাছি নমশূদ্র হিন্দুদের বিরাট বসতি। মোটামুটিভাবে গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, যশোর, নড়াইল, পিরোজপুর, বাগেরহাট আর বরিশালের হিন্দু-মুসলমান বসতির বৈশিষ্ট্য অনেকটা এই জাতেরই। এসব অঞ্চলে মুসলমান এলাকার ফাঁকে-ফোকরে বিরাট বিরাট হিন্দুপ্রধান এলাকা। জনসংখ্যার দিক থেকে হিন্দু মুসলমানেরা অনেক জায়গায় সমান। বহুকাল ধরে এরা পাশাপাশি বাস করেছে, সুখে সম্প্রীতিতে থেকেছে, মাঝে মাঝে তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে বিরাট খুন খারাবি আর কাইজ্যায় মেতে উঠেছে। ছেলেবেলায় আমাদের গ্রামাঞ্চলে শোনা অজ্ঞাত কোন লোক কাহিনীর প্রথম দুটো লাইন এখনো মনে পড়ে :

*ভাই সকল কুতূহলে করি নিবেদন*
*নমু মুসলমানের দাঙ্গা করিব বর্ণন*
*জিলা যশোহর।*

আজকাল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় সংখ্যাগরিষ্ঠরা যেভাবে সংখ্যালঘুদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে কাপুরুষোচিত খুন খারাবি চালায় এই কাইজ্যাগুলোর ধরন ছিল তা থেকে আলাদা।

এগুলো ছিল এক জাতের সাম্প্রদায়িক যুদ্ধ, প্রায় সমবলীয়ান দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে গৌরবের শক্তি পরীক্ষা। মর্যাদার মনোভঙ্গিই এর মধ্যে ছিল বড়। আগে থেকেই দিন তারিখ দিয়ে একটা ফাঁকা বড় জায়গা এই কাইজ্যার জন্যে নির্ধারিত হত—তারপর ঐ দিন নির্দিষ্ট সময়ে হিন্দু-মুসলমান ঢাল, শড়কি, বল্লম, কোচ, হ্যাজা নিয়ে নিজ নিজ দলে জড় হত :

*'ঢাকার নবাব দিলেন জবাব হাজার মুসলমান,*
*পদ্মানদী পার হইয়া ঘিরিল আসমান।'*

তারপর গগনবিদারী ধ্বনিতে আকাশ কাঁপিয়ে পরস্পরের মুখোমুখি হত তারা। দুই পক্ষের বড় বড় লেঠেলদের বর্ণনা এরকম :

*এল নিধিরাম যেমন নাম তেমন তাহার কাম*
*বন সজারুর মতন তাহার গায়ের সকল চাম।*
*এল ছদন মাল জুতির কাল বিধত না যার চামে*
*দুই দশ দিন লড়াই করে গা নাহি যার ঘামে।*
*এল বচন মিঞা কোরান লিয়া এসমে আজম পাড়ি*
*ফুঁক ছুঁড়িলে হাজার লেঠেল করত গড়াগড়ি।*
*এল করিম ঢালি বারুদগুলি চিবায় যেন মুড়ি...*

[ জসীমউদদীন]

রক্তের নাচনে পাশব হয়ে উঠত লড়াইয়ের মাঠ। বীরত্বের নেশায়, ধর্মীয় গৌরবের উন্মাদনায় জীবনকে অগ্রাহ্য করে মদোন্মত্ত হয়ে উঠত দুদলের রক্ত পাগল দামাল-লড়ুয়েরা।

*[মার মার মার হাঁকল রূপা—মার মার মার ঘুরায় লাঠি,*
*ঘুরায় যেন তারি সাথে পায়ের তলে মাঠের মাটি।*
*আজ যেন সে মৃত্যু-জনম ইহার অনেক উপরে উঠে,*
*জীবনের এক সত্য মহান লাঠির আগায় নিচ্ছে লুটে!*
*মরণ যেন মুখোমুখি নাচছে তাহার নাচার তালে,*
*মহাকালের বাজছে বিষাণ আজকে ধরায় প্রলয় কালে।*

*নাচে রূপা—নাচে রূপা—লোহুর গাঙে সিনান করি,*
*মরণরে সে ফেলছে ছুঁড়ে রক্তমাখা হস্তে ধরি।*
*নাচে রূপা—নাচে রূপা—মুখে তাহার অট্টহাসি,*
*বক্ষে তাহার রক্ত নাচে, চক্ষে নাচে অগ্নিরাশি।*
*হাড়েগোড়ে নাচন তাহার, রোমে রোমে লাগছে নাচন,*
*কি যেন সে দেখেছে আজ, রুধতে নারে তারি মাতন।*

লাশ আর রক্তের বন্যায় ভরে যেত কাইজ্যার মাঠ। লড়াইয়ের পর আর্ত মাতম উঠত অসংখ্য বাড়ির নিঃস্ব চাতালের নিচে। রক্তের স্রোত আর অশ্রুর নিচে চিরদিনের জন্যে হারিয়ে যেত অনেক সম্পন্ন সংসারের প্রীতিমধুর সুখ শান্তি। কাইজ্যার পর লালপাগড়ি পরা পুলিশের দৌরাত্ম্যে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ত হাজার হাজার মানুষ। এই ছিল এই

অঞ্চলের বিখ্যাত নমু মুসলমানের কাইজ্যা। জসীমউদ্‌দীনের লেখার নানান জায়গায় এই মহাকাইজ্যার জীবন্তরূপ অমর হয়ে আছে।

৬

বাগেরহাট জেলার এক সুদূর গ্রামে আমাদের বাড়ি। সেন বাবুরা সেখানে ছিলেন একমাত্র হিন্দু ঘর। একমাত্র—কিন্তু শিক্ষা, স্বচ্ছলতা এবং দোর্দণ্ড প্রতাপে তাঁরা ছিলেন একাই একশ। চারপাশের বিশাল মুসলমান জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে রীতিমত দাপটের সঙ্গেই তাঁরা টিকে ছিলেন। কোনদিন তাঁদের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াবার সাহস কখনো কারো হয় নি এবং হবে এটাও কেউ ভাবে নি। কিন্তু পাকিস্তান আন্দোলন জোরদার হবার সঙ্গে সঙ্গে এই পরিস্থিতির খানিকটা পরিবর্তন ঘটতে শুরু করল এবং ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এক সময় একটা বিশ্রী সম্পর্কই তৈরি হয়ে গেল। বাগেরহাট তখন বৃহত্তর খুলনার মধ্যে। খুলনা তখন অল্প পরিমাণে হলেও হিন্দু প্রধান। সুতরাং খুলনার ভাগ্য যে ভারতের সঙ্গেই সম্পৃক্ত হয়ে যাবে এই আশংকাতে এই অঞ্চলের মুসলমানেরা আগে থেকেই চুপসে ছিল। তবু আন্দোলন উদ্দাম গতিতেই এগিয়ে যেতে লাগল। তাদের মনে হয়ত এমন একটা অলীক দুরাশা সুদূর সম্ভাবনার মতই কাজ করছিল যে হাজার হাজার মানুষের এইসব প্রমত্ত মিছিল ইতিহাসের আমোঘ গতিকে পাল্টে দিয়ে তাদের আকাঙ্ক্ষাকে একদিন সফল করে তুলবে। দেশের কর্ণধারদের কলমের সামান্য খোঁচায় লক্ষ লক্ষ মানুষের স্বপ্ন সাধ এক মুহূর্তে কোথায় যে উড়ে যেতে পারে, এই সব সাধারণ মানুষগুলোর সে সম্বন্ধে কোন ধারণাই ছিল না।

সেনবাড়ির মেজকর্তার ঝাঁজই মুসলমানদের ওপর ছিল সবচেয়ে বেশি। বড় বাবু কলকাতায় থাকতেন বলে মেজ বাবুর ওপরেই ছিল এই বিরাট পরিবারটার দায়িত্ব। শীর্ণ চেহারার বদমেজাজী এবং জেদী মানুষ ছিলেন তিনি। মুসলমানদের সঙ্গে এ পর্যন্ত যা কিছু তিক্ততা এবং রেষারেষি সৃষ্টি হয়েছে তার মূলে অনেকটা ছিলেন তিনিই। খুলনা যে ভারতের অন্তর্ভুক্ত হবে তা ততদিনে, অনেকের মত তাঁর কাছেও স্পষ্ট হয়ে গেছে। প্রকাশ্য হাটের মাঝখানে হাতের লাঠিটাকে মাটিতে জোরে জোরে ঠুকে বলতেন—যা খুশি চালয়ে যাও মেয়ারা। ইণ্ডিয়া হলে টের পাবানে ঠেলাখান।' হাটের মুসলমানেরা শুকনো আশংকাতুর মুখে সবকিছু শুনে যেত। কথা বলত না কেউ। দুয়েকটা জোয়ান ছোকরা হঠাৎ কথা বলে উঠতে দাপিয়ে উঠলে অন্যেরা মুখে হাত চেপে থামিয়ে দিত। বলত, 'এখন নয়রে ভাডি, এখন নয়, সময় আলি সব বলিস।'

১৯৪৭ সালে খুলনা যথারীতি ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ মুর্শিদাবাদ পড়ল পাকিস্তানে।

মেজকর্তা সেনবাড়ির বিরাট শিরীষ গাছটার মাথায় একটা ভারতীয় পতাকা উড়িয়ে রাস্তায় নেমে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলেন—কই রে ন্যাড়ারা, বাড়ির মদ্যি সেদিয়ে আছিস কেন এখন, বাইরি আয়, তোগো পাকিস্তান দেখে যা। কিন্তু কোন ন্যাড়ারপোকে আর তাদের সাধের পাকিস্তান দেখার জন্য বাইরে আসতে দেখা গেল না। ঘরের ভেতর মৃহ্যমান অবস্থায় শুয়ে তারা তখন তাদের রিক্ত অন্ধকার ভবিষ্যতের আশংকায় নির্জীব হয়ে আছে। এর তিনদিন পর, ১৭ই আগস্ট, হঠাৎ অভাবিতভাবে খবর এল খুলনা

পাকিস্তানে পড়ে গেছে, পরিবর্তে মুর্শিদাবাদ ভারতে। দেশ নেতাদের কলমের খেয়ালি খোঁচায় ঘটে গেছে এই অলৌকিক ব্যাপার।

খবর পৌঁছোতেই প্রতিটা গোলপাতায় ছাওয়া দাওয়ার নিচে গালে হাত দিয়ে বসে-থাকা হাজার হাজার মৃহ্যমান মুসলমান অপ্রত্যাশিত আনন্দে চিৎকার করতে করতে চারদিক থেকে পাগলের মত ছুটে এল দেপাড়ার হাটের চৌহদ্দিতে। চিৎকারে, উল্লাসে, আনন্দাশ্রুতে, আলিঙ্গনে, কোলাকুলিতে জায়গাটাকে মুখর করে রাখল সারাটা দিন। বিকালের দিকে উত্তাপ খানিকটা ধরে এলে রোল উঠল, চল যাই, সেনবাবুদের একবার দেখে আসি। হাজার হাজার কণ্ঠ সোল্লাসে সমর্থন জানাল।

দেখতে দেখতে শকয়েক অল্পবয়সী ছোকরা ফূর্তির তোড়ে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল সেনবাবুদের বাড়ির ভেতরে। দলের মধ্য থেকে একজন রসিক ছোকরা হেঁকে উঠল—কই মেজকর্তা, ঘরে শুয়ে ক্যানো। আপনার ইণ্ডিয়া দেখতি তো একবার বাইরি আসতি হয়। উল্লসিত জনতা হো হো করে হেসে বিদ্রূপটাকে সারা তল্লাটে ছড়িয়ে দিল। আমার ধারণা এই তিনদিনে মুর্শিদাবাদে যা ঘটেছিল তার গল্প এ থেকে আলাদা কিছু নয়।

এর পর মেজকর্তার ইতিহাস বড় করুণ। সেই দোর্দণ্ডপ্রতাপ মানুষটা দিনে দিনে ছোট হতে হতে প্রায় ছায়ার সঙ্গে মিশে গেলেন। হাটে বাজারে কৃচিৎ-কদাচিৎ তাঁকে দেখা যেত। অধিকাংশ সময় তিনি থাকতেন লোকচক্ষুর বাইরে, ঘরের ভেতর বিছানায় শুয়ে কী সব যেন ভাবতেন দিনরাত, হয়ত ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে নিজের মনের মধ্যেই জল্পনা কল্পনা করে যেতেন তিনি। যে মর্যাদা নিয়ে তিনি চারপাশের অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত মুসলমান চাষাভূষোদের সামনে মাথা উঁচু করে এতকাল দাঁড়িয়ে ছিলেন তাদের অনুগ্রহ নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুও যে ভালো। বছরখানেক পর একদিন সকালে হঠাৎ শোনা গেল তিনি সপরিবারে ভারতে চলে গেছেন। দেখতে দেখতে তিন-চার বছরের মধ্যে সেন বাড়ির প্রায় সব কজন শরীক নামমাত্র দামে জমিজমা পৈত্রিক ভিটা বিক্রি করে কলকাতা বা অন্য কোথাও চলে গেলেন। এককালের বৈভবোজ্জ্বল তাদের পরিত্যক্ত বিমর্ষ বাড়িতে গুটিকয় মুসলমান গৃহস্থ পরিবার উঠে এসে শ্রীহীন আস্তানা গেড়ে বসল।

৭

১৯৪৭ সালের স্বাধীনতার সময়ে পূর্ব ও পশ্চিম পাঞ্জাবে মুসলমানদের সঙ্গে হিন্দু ও শিখদের যে দাঙ্গা পাকিয়ে ওঠে ব্যাপকতায় ও প্রচণ্ডতায় তা এই উপমহাদেশের স্মরণকালের মধ্যে ভয়াবহতম। পাশব তাণ্ডবলীলা যে কী ভয়ঙ্কর চেহারা নিয়ে জেগে উঠেছিল তার খানিকটা বিবরণ আছে কৃষণ চন্দরের 'গাদ্দার' উপন্যাসে। উপন্যাসের নায়ক বৈজনাথের নিজের চোখে দেখা দুএকটা টুকরো ছবির মধ্যে হতভাগ্য মানবতার সেই করুণ অশ্রু জমাট বেঁধে আছে :

১. আমার দুচোখ পানিতে ভরে গেল। মনে হল সমগ্র পাঞ্জাব একটি বৃদ্ধ ব্যক্তির বেশে দাঁড়িয়ে আছে। একটি শ্বেতশ্মশ্রু কৃষাণ—যার সাদা দাড়িতে দুর্বৃত্তেরা আগুন লাগিয়ে দিয়েছে।

পাঞ্জাব জ্বলছে—আর ঐ শ্বেতশ্মশ্রু বৃদ্ধ অসহায় বেদনায় কাঁদছে...দু'টি চোখ মুছে মাথা নেড়ে নেড়ে রুদ্ধ গলায় বলছে :

"গাড়ি এল গাড়ি এল
নাড়ুয়াল থেকে
বুড়োর দাড়িতে
দেখো আগুন লেগেছে।"

২. "হায়! কেমন করে বলব এ দেশ আমার নয়, যে দেশের মাটির প্রতিটি কণা আমার হৃদয়ে হীরার কুচির মত দীপ্তি ছড়াচ্ছে। কেমন করে বলব এই আমার দেশ যেখানে আমার সমগ্র অনুভূতি অচেনা আগন্তুকের মত। ইরাবতীর এপার-ওপারে তো কোন পার্থক্য আমি দেখতে পাচ্ছি না। দুই তীরে শবের রাশি। মধ্যে নদীর নীল জলস্রোত বইছে যা হিন্দু-মুসলমান এই দুনিয়াতে আসবার বহু আগে থেকেই বইছিল।"

৩. "মৃত্যুপথযাত্রীর মুখ থেকে শেষ যে নাম উচ্চারিত হয়েছিল সে নাম ঈশ্বরের। হত্যাকারীদের মুখেও ছিল তাঁরই নাম।..."

৪. "কোথায় যাচ্ছ তোমরা শ্বেতপক্ষ রাজহংসের দল, আমাকে তোমাদের সঙ্গে নিয়ে চল কোনো অজ্ঞাত ঝিলের কিনারায়। মানুষের দুনিয়া থেকে বহুদূরে।

...আমাকে এখানে ফেলে যেও না বন্ধু। আজ মানুষের দুনিয়ায় বড় অন্ধকার। বড় অন্ধকার। বড় নীচতায় ভরা এই পৃথিবী।"

দাঙ্গার আরও একটা জীবন্ত বর্ণনা আছে ভীষ্মদেব সাহানীর 'তমস'-এ।

এই দাঙ্গার ভয়ংকর হিংস্রতা এক সময় থিতিয়েও এল, আপাত স্বস্তি নেমে এল দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে :

মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতা শেখ নূর ইলাহী হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতা লালা লক্ষ্মীনারায়ণকে জড়িয়ে ধরল, ঠাট্টা করল, কিন্তু স্বার্থ তাদের এক করলেও এই ক্ষতচিহ্ন এত সহজেই মুছে গেল কি?

ভয়াবহ দাঙ্গার জের হিশেবে পূর্ব-পাঞ্জাবের মুসলমান এবং পশ্চিম পাঞ্জাবের হিন্দু ও শিখদের দেশত্যাগের ব্যাপকতা হল অবিশ্বাস্য। হত্যাকারীদের বল্লম থেকে কোনমতে প্রাণ বাঁচিয়ে লক্ষ লক্ষ হিন্দু ও মুসলমান দল বেঁধে একসাথে নিজেদের পিতৃ-পিতামহের ঘর-বাড়ী, আত্মীয়-বন্ধু, জন্মভূমি, ধর্ষিতা মা-বোন আর প্রিয়জনের লাশ ফেলে ভয়ার্ত পশুর মতো সীমান্তের অপর পারের দিকে ছুটে গেল।

এই সময়কার কোলকাতার দাঙ্গাও আদিমতার নগ্ন আত্মপ্রকাশে কম হৃদয়বিদারক ছিল না। দেশ বিভাগের সমসময়ে বা পর পরই ঢাকায়, নোয়াখালিতে এবং পূর্ব-পাকিস্তান ও পশ্চিম বঙ্গের নানান বিক্ষিপ্ত জায়গায় দাঙ্গার লেলিহান শিখা ছড়িয়ে যায়। প্রায় সব এলাকাতে দাঙ্গার চরিত্র ছিল একই। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অরক্ষিত অসহায় নর-নারীর ওপর সংখ্যাগরিষ্ঠের লুটতরাজ, হত্যা, অগ্নিসংযোগ আর ধর্ষণের বেদনাময় ইতিহাস।

উত্তর ভারতের ভয়াবহ দাঙ্গার বর্ণনা ঐ এলাকার বেশ কিছু প্রতিভাবান লেখকের শক্তিমান লেখনীর কারণে আজও স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশবিভাগ ও হৃদয়বিভাগের মর্মন্তুদ কাহিনী আজ পর্যন্ত আমাদের ভাষার কোনো শক্তিমান সাহিত্যিক তাঁর রচনার উপজীব্য করেন নি। ফলে যুগ-যুগান্তের নৃতাত্ত্বিক ও অভিন্ন একটি জনগোষ্ঠীর বিভক্ত হয়ে যাবার বেদনাময় ইতিবৃত্ত নিঃশব্দেই বিস্মৃতির নিচে চাপা পড়ে গেল।

আগেই বলেছি পাঞ্জাবের দাঙ্গা টর্নেডোর মত আকস্মিক ঝাপটায় দুটো সম্প্রদায়কেই ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল। স্তব্ধ, হতচকিত, দিশেহারা মানুষের আকস্মিক দেশত্যাগ তাই হয়েছিল সম্পূর্ণ পরিকল্পনাহীন ও সর্বাত্মক। পূর্ব-পাকিস্তান থেকে পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুদের দেশত্যাগ কিন্তু এমন দিশেহারা এবং বিভ্রান্ত ছিল না। এদের দেশত্যাগের ব্যাপারটা ঘটেছিল অনেক ধীরে ধীরে, অনেক বছর ধরে, বুঝে-শুনে পরিকল্পিতভাবে। হিন্দুদের দেশত্যাগের উন্মাদনা সবচেয়ে সক্রিয় ছিল ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫৫ সালের মধ্যে। এরপরে এই গতি ধীরে ধীরে থিতিয়ে আসে।

আমার আব্বা জামালপুর থেকে পাবনা এডওয়ার্ড কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে যান ১৯৪৮ সালে, আমি তখন চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ি। আমি ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিই ১৯৫৫ সালে। কাজেই বলা যেতে পারে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে হিন্দুদের দেশত্যাগের প্রধান নাটকটি আমার চোখের সামনেই সংঘটিত হয় আমার স্কুল জীবনের সময়পরিসরে—আমার জীবনের সবচেয়ে স্বপ্ন-স্নিগ্ধ দিনগুলোয়।

৮

পাবনায় আসার আগে আমি যে দুই জায়গায় ছিলাম সে জায়গা দুটোতেই ছিল মুসলমান সংস্কৃতির প্রাধান্য। অনেক কিছুর কর্তৃত্বও ছিল মুসলমানদের হাতে। কিন্তু পাবনার মধ্যবিত্ত ছিল হিন্দুপ্রধান। আমাদের বাসা ছিল কলেজ কম্পাউণ্ডের এক নির্জন প্রান্তে, শীর্ণ রুপোলি ইছামতীর গা ঘেঁষে। কলেজ-মাঠের দক্ষিণ দিকে রাধানগরের জমিদারদের প্রতিষ্ঠিত স্কুল—রাধানগর মজুমদার একাডেমি। কলেজ-ইস্কুল ঘিরে-থাকা বেশ একটা বিরাট এলাকা জুড়ে রাধানগর গ্রাম। রাধানগরের উত্তর দিকের একটা বড় এলাকা জুড়ে মজুমদারদের বিশাল দোতলা জমিদার বাড়ি—বাড়ির সামনে পুকুরের একটা ধার-বরাবর দেবদারুর রহস্যময় সবুজ অরণ্য। সারাটা পাড়া জুড়ে মধ্যবিত্ত হিন্দুদের একের পর এক ছিমছাম পরিপাটি বাড়িঘর—এঁদের কেউবা উকিল, কেউ শিক্ষক, কেউ ডাক্তার, কেউ ছোট চাকুরে, কেউবা গ্রাম এলাকার বিস্তর জায়গা-সম্পত্তির মালিক। বিকেলের দিকে রোদ পড়ে এলে বাড়িগুলোকে শান্ত ছবির মত দেখাত। প্রায় প্রতিটি বাড়ির সামনে একটি করে ছোট্ট ফুলের বাগান। দৈনন্দিন পূজা-অর্চনায় ফুল দরকার হত বলে প্রায় প্রতিটা হিন্দু পরিবারেই কমবেশি ফুল গাছের চর্চা ছিল। ভোরে আর সন্ধ্যায় প্রায় প্রতিটি বাড়ি থেকে হারমোনিয়মের মিষ্টি শব্দ ভেসে আসত। সব মিলে মোটামুটি একটা মার্জিত প্রাণঢালা মনোরম পরিবেশ। যাঁরা নেহাতই নিম্ন-মধ্যবিত্ত ছিলেন তাঁদের ঘরবাড়িগুলোতেও পরিপাট্য ও পরিশীলনের একই ব্যতিক্রমহীন ছাপ পাওয়া যেত। অদ্ভুত মানুষ ছিলেন এই মধ্যবিত্তেরা। একটা বড় জীবনের মূল্যবোধের স্বপ্ন ছিল এঁদের সামনে—সে স্বপ্নে এরা উজ্জীবিত ছিলেন। সবকিছুকে সহজ আর সুন্দর করে বেঁচে থাকতে শিখেছিলেন এরা। হয়ত বাড়িঘর নেহাতই আটপৌরে, কিন্তু সবকিছুর ভেতর এমন একটা অসামান্য শ্রী যে দেখে লোভ হত। বেড়ার বাড়ির সযত্নে নিকোনো পরিপাটি আঙিনা মেঝে দেখে লোভ জাগত, বিছানা-আলনা-আসবাবের ছোট্ট সাজানো পরিপাটি সংসারটুকু দেখে লোভ হত, এমনকি লোভ হত কপালে টিপ-পরা, ঘরের টুকটুকে লক্ষ্মী বউটিকে দেখলেও। সরল অনাড়ম্বর আর পরিতৃপ্ত জীবনের আদর্শ প্রতিচ্ছবি ছিলেন এঁরা।

শিক্ষকতা উপলক্ষে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'ফুলের মূল্য' নামে একটা গল্প আমাকে ছাত্রদের পড়াতে হত। ইংরেজদের সৌন্দর্যবোধ এবং মূল্যবোধগুলো সমাজের কত নিচুস্তরের মানুষের চেতনা পর্যন্ত চারিয়ে গিয়েছিল এটা দেখানোই গল্পটার উদ্দেশ্য। সাধারণ দারিদ্র্যক্লিষ্ট পরিবারের একটা মেয়ের মধ্যেও সংস্কৃতির আলো কীভাবে দীপ্তি ছড়াচ্ছে সেটা তুলে ধরে তিনি তাঁর বক্তব্য বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন গল্পটাতে। নানান ধরনের সামাজিক-অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সীমাবদ্ধতার কারণে ইউরোপের রেনেসাঁসের মত বাংলাদেশে রেনেসাঁসের আলো এদেশের আপামর জনসাধারণের জীবনের নিচু-তলা পর্যন্ত পৌঁছোতে পারেনি, মধ্যবিত্তের ছোট্ট গণ্ডীর ভেতরেই সীমিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু দেশের মানুষের ছোট্ট একটা অংশের চিত্তকে এই রেনেসাঁস যেভাবে আলোকিত ও পরিশীলিত করে তুলেছিল তা আগামী সময়ে অনেকের চোখেই বিস্ময় জাগাবে। সংখ্যায় অল্প হলেও এই রেনেসাঁসের স্বপ্ন ও জীবন-সাধনার ভেতর থেকে এই জাতির মধ্যে এমন কিছু শুদ্ধচিত্তসম্পন্ন, উচ্চায়ত মানুষের উত্থান ঘটেছিল পৃথিবীর প্রধান সভ্যতাগুলোর রাজপথেই কেবল যাদের সমকক্ষ মানুষদের খোঁজ মেলে।

সংস্কৃতিবান ও আলোকিত এই হিন্দু-মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে আমি দেখেছিলাম আমার কৈশোরে। তাঁদের সেই দীপান্বিত স্মৃতি আজও আমার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এই হিন্দু-মধ্যবিত্তের জন্ম একদিনে হয় নি। ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে সূচিত হয়ে যে রেনেসাঁসের আলো বাঙালির একটা অংশের চিত্তকে সম্পন্ন বর্ণচ্ছটায় আলোকিত করেছিল এই মধ্যবিত্তেরা ছিলেন তাঁদেরই উত্তরসূরী। আমার কৈশোরে দেখা হিন্দু-মধ্যবিত্তের মধ্যে মহান বাঙালির সেই সর্বশেষ বর্ণচ্ছটাকে আমি বিষণ্ন চোখে তাকিয়ে দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম।

সত্যি সত্যিই একটা সমৃদ্ধ মধ্যবিত্ত হিন্দু সম্প্রদায়কে দেখেছিলাম আমি এই সময়ে। আদর্শবান, সৌন্দর্যপ্রিয়, মূল্যবোধসম্পন্ন, জ্ঞানপিপাসু, পরিশীলিত ও সপ্রতিভ একটা সম্প্রদায়। বৃটিশ আমলের প্রথম দিকে যখন উপেক্ষিত মুসলমানেরা বৃটিশদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিজেদের অভিমানী বিবরের ভেতর তিলে তিলে ক্ষয়ে যাচ্ছিলেন, সেই সময়ে এই হিন্দু মধ্যবিত্তদেরই একটা অংশ বৃটিশদের সঙ্গে সহযোগিতা করে নিজেদের আখের গুছিয়েছেন বৃটিশ প্রভুদের সামনে নতজানু হয়ে এদেশে তাদের টিকে থাকার সুবিধা করে দিয়েছেন, অথচ আবার এঁদেরই অন্য কিছু মানুষ সেকালের ইউরোপের রেনেসাঁসের মহান চেতনাকে আত্মস্থ করেছেন, স্বাদেশিকতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন, দেশপ্রেমের গান গেয়েছেন, বৃটিশদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন, সহিংস সংগ্রাম করেছেন। বৃটিশদের কাছ থেকে পাওয়া মূল্যবোধ দিয়েই তাঁরা বৃটিশের সাম্রাজ্যবাদকে প্রতিহত করেছেন। বৃটিশদের সঙ্গে সংগ্রাম করতে গিয়ে তাঁরা প্রকৃতির নিয়মেই জেনে গিয়েছিলেন যে এমন চতুর, প্রবল ও জ্ঞানবান শত্রুকে এদেশ ছাড়তে বাধ্য করা কেবল অস্ত্রের শক্তি দিয়ে সম্ভব হবে না—শারীরিক শক্তির পাশাপাশি জ্ঞানের শক্তিও তাদের বাড়াতে হবে। এজন্যে সারাদেশের পাড়ায় পাড়ায় রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মীরা স্বাস্থ্য-চর্চা সংঘের (আখড়ার) পাশাপাশি অসংখ্য পাঠাগার গড়ে তুলেছিলেন। আমার সারাটা স্কুলজীবনের পরিসর জুড়ে, অকর্ষিত পাকিস্তানী মনোভাবের কঠোর বিরোধিতার মুখে এক গভীর বেদনার ভেতর আমি আমার শহরের প্রতিটা পাড়ার লাইব্রেরি আর আখড়াগুলোকে ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যেতে

আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি তখন আমার এক আত্মীয়াকে তার প্রবল অমতে এক ডাক্তার ভদ্রলোকের সাথে বিয়ে দেয়া হয়। রুচির দিক থেকে ডাক্তার ভদ্রলোকটি ছিলেন আমার ঐ আত্মীয়ার তুলনায় বেশ খানিকটা নিচু মানের এবং কিছুটা অকর্ষিত। পারিবারিক অভিজাত্যের দিক থেকেও ভদ্রলোকটির অবস্থান ছিল ভদ্রমহিলার অনেক নিচে। এর পরিণাম শেষ পর্যন্ত এই দাঁড়িয়েছিল যে ভদ্রমহিলা সারাজীবন নিজের ভাইবোনদের আশ্রয়ে, অসম্মানিত নিঃস্ব জীবন কাটিয়ে তিলে তিলে নিজেকে শেষ করেছিলেন, কিন্তু ঐ অমার্জিত মানুষটির সঙ্গে ঘর করেন নি বা তাঁকে স্বামী বলেও স্বীকার করেন নি। গল্পটার প্রসঙ্গ টেনে আনলাম এ কথাটা বলার জন্য যে উন্নততর সংস্কৃতির মানুষের পক্ষে নিম্নতর সংস্কৃতির মানুষের সঙ্গে এক হয়ে বাস করা খুবই কঠিন, বিশেষ করে ঐ নিম্ন সংস্কৃতির অমার্জিত মানুষদের সামনে যদি নত হয়ে বাঁচতে হয়।

মনসামঙ্গলের গল্পে এরই একটা ছোট্ট উদাহরণ আছে। দেবাদিদেব শিবের একনিষ্ঠ ভক্ত ও পূজারী ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতির ধারক চাঁদ সদাগরের কাছে নিম্নতর অনার্য সংস্কৃতির দেবী মনসা পূজা চাইলে নিজের সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্বের গৌরবে গর্বিত চাঁদ সওদাগর দৃপ্তস্বরে জানিয়েছিল :

*যে হাতে পূজেছি আমি দেবশূলপাণি।*
*সে হাতে পূজিমু আমি চেংমুড়ির কানি॥*

না, একটা উন্নততর সংস্কৃতির গর্বিত উত্তরাধিকারী হয়ে একটা ইতর-সংস্কৃতির দেবীর বেদীতে পূজা দেয়া সম্ভব নয় তার পক্ষে—কালীদহের আবর্তে তার সাধের সপ্তডিঙা বানচাল হয়ে গেলেও না, মনসার আক্রোশে তার সমৃদ্ধ বংশের ধ্বংস হয়ে গেলেও না। না, কিছুতেই পারবে না সে। পারে নি পূর্ব-পাকিস্তানের হিন্দু-মধ্যবিত্তরাও। পুরুষানুক্রমে তাঁদের বৈভব আর প্রতাপের সামনে নতজানু একদল ভূলুণ্ঠিত অপমানিত মানুষকে সমীহ করে এই অসম্মানিত দেশে ধিক্কৃত জীবনধারণ করা কিছুতেই সম্ভব হয় নি তাঁদের পক্ষে। তাই তাঁরা নিঃশব্দে, নতমুখে চলে গিয়েছিলেন।

প্রায় একই ঘটনা ঘটেছিল বৃটিশ আমলের প্রথম দিকে মুসলমানদের জীবনে। একটা রাজকীয় জীবনের বিত্ত আর বৈভব থেকে নিপতিত হয়ে, প্রায় একইভাবে, অভিমনাহত জীবনের অর্থহীনতার ভেতর তাঁরা ধীরে ধীরে একসময় ঠিক এমনিভাবেই নিঃশব্দে হারিয়ে গিয়েছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানেরা পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের তুলনায় সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিকভবে উন্নত ছিলেন না বলে তাঁদের ঠিক এ ধরনের অবমাননাকর অবস্থায় পড়তে হয় নি। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুদের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের মধ্যে দেশত্যাগের তাড়না ছিল অনেক কম।

সংস্কৃতিবান হিন্দুরা একে একে নিঃসঙ্গভাবে দেশ ছেড়ে চলে গেলেন। আমাদের সৌন্দর্যের, আনন্দের, প্রেমের জগৎটাকে প্রায় খালি করে যেন চলে গেলেন তাঁরা। সারাটা দেশে তাঁদের নিজ নিজ বাড়ির ছোট্ট বাগানগুলোয় ফুলের যে অপার জলসা তাঁরা ফুটিয়ে রেখেছিলেন, তাঁদের চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সেই ফুলগুলোও যেন হঠাৎ করেই অদৃশ্য হয়ে গেল। কোথাও একটি ফুলের চিহ্নও যেন আর রইল না।

তাঁদের পরিত্যক্ত বাড়িঘরগুলোয় একে একে এসে উঠলেন সেকালের উঠতি মুসলমানেরা। এঁদের অধিকাংশই গ্রাম থেকে আসা, শক্ত-সমর্থ, এক ধরনের খাটুয়ে মানুষ। শিক্ষার দিক থেকে প্রথম প্রজন্মের লোক এঁরা। সৌন্দর্যের বা মাধুর্যের স্পর্শ তখনও তাঁদের অনেকের জীবনেই পৌঁছোয় নি। বাড়ির বাগানের ফুলগাছগুলোকে কেউ কেউ অলাভজনক পণ্ডশ্রম ভেবে গোড়াশুদ্ধ উপড়ে দেয়ালের ওপারে চিরবিদায় করে দিলেন। তারপর সেই বাগানটাকে ভালোভাবে চষে পোক্ত অভ্যস্ত হাতে নানান মাপের জাংলা বানিয়ে হরেক রকম তরি-তরকারির গাছ লাগালেন চটপট। ফুল বিদায় হয়ে সারাটা দেশ চালকুমড়া, কদু, ওল আর ধুন্দুলে 'লাভজনক' হয়ে উঠল।

আমাদের দেশে এই তরি-তরকারির যুগ চলেছে প্রায় বিশ-পঁচিশ বছর—১৯৫০-৫৫ থেকে ৭৫ পর্যন্ত। সত্তর দশকের মাঝামাঝিতে প্রায় হঠাৎ করেই আবার দেখা গেল, ফুল ফিরে আসছে সব জায়গায়। আমাদের ছেলেমেয়েরা, আমাদের পরের প্রজন্মের রুচি-প্রত্যাশী তরুণ-তরুণীরা, আমাদের চেয়ে সাংস্কৃতিকভাবে অগ্রসর কিশোর-কিশোরীরা আবার ফুলের চর্চায় উন্মুখ হয়ে উঠছে। বাড়ির সামনের ছোট আঙিনাটুকুতে হোক, ছাদে হোক, হোক চিলতে পরিমাণ বারান্দায় বা কার্নিশে—যে যেখানেই পারছে নানা রঙের ফুলের সমারোহ ঘটিয়ে জীবনকে আবার সৌগন্ধময় ও বাসযোগ্য করে তুলতে চাইছে। পঞ্চাশের দশকের প্রথম দিকে হিন্দু-মধ্যবিত্ত এদেশ ছেড়ে চলে যাবার সময় যে রুচি ও সৌন্দর্যকে তাদের সঙ্গে করে নিয়ে চলে গিয়েছিল আমাদের পরের প্রজন্মের সুস্মিত ছেলেমেয়েরা সেই মাধুরী-পিপাসাকে আবার আমাদের কাছে ফিরিয়ে আনতে শুরু করেছে।

১০

হিন্দুদের দেশত্যাগের আরেকটা কারণ ছিল। দুশো বছর ধরে কোলকাতা ছিল বৃটিশ বাংলার রাজধানী। (এর আবার অধিকাংশ সময় জুড়েই তা ছিল খোদ বৃটিশ ভারতের রাজধানী।) কাজেই এই দুই শতাব্দী ধরে কি হিন্দু কি মুসলমান—সারা বাংলার সব মানুষের স্বপ্ন ছিল এই শহর কোলকাতা। কেবল বাংলার মানুষের নয়, সারা ভারতবর্ষের মানুষেরই লক্ষ্য তখন কোলকাতা। বাংলার সব শিক্ষিত মধ্যবিত্তের ঢল তখন হিংস্র অপ্রতিহত স্রোতে কোলকাতামুখি। চল, চল—কোলকাতা চল, সবার স্বপ্ন আর শ্লোগান এই একটাই। একটু সুযোগ পেলেই হল—বিচার-বিবেচনার অবকাশ নেই, ভালোমন্দ নিয়ে মাথা ঘামাবার সুযোগ নেই, তড়িঘড়ি ছুট লাগাও কোলকাতায়—দালানবাড়ি না হোক ওঠ গিয়ে বস্তিতে, বস্তি না পেলে মেসে, তবু চল কোলকাতা। পরেরটা পরে দেখা যাবে, আপাতত মাথা গোঁজার একটু ঠাঁই হলেই হয়। যেন কোলকাতাতেই ধর্ম, কোলকাতাতেই অর্থ, কোলকাতাতেই কাম ও মোক্ষ। দেড় শ বছর ধরে দেশজোড়া হাজার হাজার সমৃদ্ধ জনপদের সেরা মানুষদের বিচ্ছিন্ন হবার কান্না দিয়েই ধীরে ধীরে তৈরি হয়েছিল কোলকাতার সমৃদ্ধির বৈভবময় বিশাল সৌধের সারি।

১৯৪৭ সালের দেশবিভাগের পর পূর্ব-পাকিস্তানের হিন্দুদের এই কোলকাতামুখি স্রোত দুর্বার হয়ে উঠল। আত্মীয়-স্বজনের সূত্র ধরে, সামান্য চাকরি সম্বল করে, ব্যবসার ক্ষীণতম আশ্বাস পেয়ে কিংবা কিছুই না পেয়েও এখানকার বর্ধিষ্ণু হিন্দুরা দেশত্যাগ করে

চললেন। তবু মনে রাখতে হবে, এই দেশত্যাগ ছিল পরাজিতের দেশত্যাগ। তাই এটা ছিল নিঃশব্দ। নীরব বেদনার অগোচর পথে বছরের পর বছর ধরে এই অলক্ষ্য ব্যাপারটা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১১

উদ্বাস্তু মানুষের বিরামহীন অপ্রতিহত চাপে কোলকাতার নাগরিক জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠতে লাগল। ফুটপাতে শুয়ে-থাকা মানুষ, বেকার, ফেরিওয়ালা, উদ্দেশ্যহীন যুবক, সর্বস্ব-খোয়ানো এককালের সঙ্গতিপূর্ণ সম্ভ্রান্ত মানুষের ঠাসাঠাসিতে ক্লেদাক্ত হয়ে উঠল কোলকাতার মার্জিত নাগরিক পরিবেশ। বিশাল উদ্বাস্তু সমস্যার চাপে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে গেল কোলকাতার জনসাধারণের জীবন। যে আলোকিত হিন্দু-মধ্যবিত্তকে দেখে আমি একদিন মনুষ্যত্বের মহিমাকে শ্রদ্ধা করতে শিখেছিলাম, কোলকাতার অনিশ্চিত উদ্বাস্তু জীবনের আবিলতার ভেতর তাদের সেই ঐশ্বর্য আর মহিমা দেখতে দেখতে নিঃস্ব ও শ্রীহীন হয়ে এল। দুচারজন ভাগ্যবান ছাড়া এদের প্রায় সবাই কোলকাতা আর তার শহরতলির নিম্নবিত্ত বস্তিগুলোর ভেতর তাদের ফেলে-আসা জীবনের সম্পন্ন স্মৃতিগুলোকে বুকে নিয়ে জীবনের কঠোর বাস্তবতার সঙ্গে লড়াই করে নিঃশেষিত হতে লাগলেন প্রতিদিন।

মহান বাঙালি রেনেসাঁসের উত্তরাধিকারীদের যারা শেষ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে থেকে গেলেন, চারপাশের প্রবল সামাজিক প্রতিকূলতার ভেতর, তাঁরাও, প্রকৃতির নিয়মেই, একসময় বিলুপ্ত হয়ে যেতে লাগলেন। যে সামাজিক, রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতির আনুকূল্য পেয়ে বাংলাদেশের ছোট বড় শহরগুলোর শান্ত ছায়াবহুল পৃথিবীতে সেই পরিশীলিত ও সংস্কৃতিস্নাত হিন্দু-মধ্যবিত্তের বিকাশ ঘটেছিল, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পর, সম্পূর্ণ আলাদা ও আবিল বাস্তবতার ভেতর পশ্চিমবঙ্গেও তাঁদের বিকাশ ও বেঁচে থাকা ধীরে ধীরে অসম্ভব হয়ে এল। পূর্ব পাকিস্তানের মতন পশ্চিম-বঙ্গ থেকেও তাঁরা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যেতে লাগলেন একসময়। সারা পৃথিবী থেকেই যেন বিদায় নিয়ে গেলেন তাঁরা। আজ পৃথিবীর কোথাও কোনোখানে তাঁরা আর নেই।

১২

ইংরেজরা কোলকাতা শহরকে গড়ে তুলতে চেয়েছিল বৃটিশ ভারতের বৈভবময় রাজধানী হিশেবে। চওড়া ফুটপাত, সুপ্রশস্ত সমান্তরাল সড়ক, সুচিন্তিত নগর-পরিকল্পনা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পার্ক, বিশ্ববিদ্যালয়, যাদুঘর, সরকারী ও বাণিজ্যিক ভবনের রাজকীয় শ্রী এবং স্থাপত্য সৌকর্য আজও প্রমাণ দেয় বৃটিশ গৌরবের অভ্রভেদী চূড়া হিশেবেই তারা এই নগরের নির্মাণ করতে চেয়েছিল। আগেই জানিয়েছি আমার জন্ম কোলকাতায়। তাই বেড়াবার ছুতো ধরে ছেলেবেলায় মাঝে মাঝে কোলকাতায় যাওয়া পড়ত।

বৃটিশ মহিমার বিদায়-দিনের ছোঁয়া-লাগা ছবির মত ঝকঝকে কোলকাতার স্মৃতি আজও চোখে ভাসে। সে কোলকাতার রাস্তা, বাড়ি, দোকানপাট সব কিছুর মধ্যেই আভিজাত্য, রুচি আর পরিচ্ছন্নতার স্পর্শ। প্রতি সকালে রাস্তাঘাট ধোয়া চলছে, উজ্জ্বল রঙিন ট্রামগুলো দৃষ্টিনন্দন, পার্কগুলো সবুজ, রাস্তা ছিমছাম, জনবিরল। ১৯৬৩ সালে কোলকাতায় বেড়াতে গিয়ে আমার শৈশবের সেই 'তিলোত্তমা' কোলকাতাকে আর দেখতে

পাই নি।

মানুষের চাপে, দারিদ্র্যের চাপে, সমস্যা-সংকটের চাপে কোলকাতা ততদিনে মৃত্যুপথযাত্রী। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে শুরু করে যে কোলকাতা একদিন সারা ভারতের ভাগ্যকে নির্ধারণ করেছে, সংকটে দুর্দিনে পথ দেখিয়েছে, যে কোলকাতার রাস্তায় রামমোহন-বিদ্যাসাগরের মত শক্তিমান, মানব-দরদী আর তেজস্বী মানুষেরা হেঁটে বেড়িয়েছেন, যে শহর এই জাতির জীবনে অসংখ্য অবিস্মরণীয় মনীষী উপহার দিয়ে বাংলার রেনেসাঁস ঘটিয়েছে সেই কোলকাতার কলেজ স্ট্রীটের চৌমাথায় বিদ্যাসাগরের আবক্ষ মূর্তি ততদিনে ফুটপাথের খোলা দোকান, ক্যানভাস আর প্লাস্টিকের কাঁধ-ব্যাগের গাদাগাদির আড়ালে পুরোপুরি ঢাকা পড়ে গেছে, কেবল ওপরের দিকে তাঁর খোলা গোল মাথাটুকুকে শহুরে পাখিদের নির্বিকার প্রাকৃতিক ক্রিয়াকর্মের চমৎকার জায়গা করে দিয়ে বিংশ শতাব্দীর বিনিষ্ট নগরী কোলকাতা দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরকে হয়ত তখনও পরোপকারের খানিকটা সুযোগ দিয়ে চলেছে।

১৩

সোমেন চট্টোপাধ্যায়, আমাদের সোমেন, রাধানগর স্কুলে আমার সহপাঠী ছিল। আমি তখন ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ি। ওদের বাড়ি ছিল মজুমদারদের জমিদার বাড়ির কাছাকাছি, রাস্তার ধারেই। পাকা দোতলা বাড়ি। সোমেনদের বাড়ির সবাই ছিল খুব সুদর্শন। কাঁচা সোনার মত গায়ের রং ছিল সবার। মনে আছে আমাদের সহপাঠী সুধীর একবার লম্বা বক্তৃতা দিয়ে আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল কী কী ঐশী পারম্পর্যের ভেতর দিয়ে উঁচু ঘরের ব্রাহ্মণদের গায়ের রঙ ওরকম সোনালি হয়ে যায়। সোমেনরা ছিল দুই ভাই চার বোন। ওর বোনদের অসামান্য রূপের খ্যাতি তখন সারা শহরের আলোচনার বিষয়।

বিকেলে ওর বোনেরা বাসার সামনের বাগানের ফুলগাছে পানি দিত, মাঝে-মধ্যে পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে দল বেঁধে রাস্তায় গল্প করতে বেরোত। পাড়ার প্রায় সবকটা উঠতি বয়সের ছেলে ঠিক এই সময়টাকেই রাস্তায় ওদের হেঁটে বেড়ানোর সময় করে নিয়েছিল। কিসের এক অদৃশ্য টানে ওরা এই সময় সোমেনদের বাসার সামনের রাস্তাটা ধরে এগিয়ে যেত, বাসার কাছাকাছি হতেই কমে আসত ওদের কথাবার্তার শব্দ আর পায়ের গতি, বাসার সামনের বাগানে ওর বোনদের আড়চোখে সাহস করে দুয়েকবার দেখে নিত দলের ভেতরকার সাহসী দুয়েকজন। তারপর একটা অদ্ভুত আচ্ছন্নতায় পেয়ে বসত ওদের। অনেকক্ষণ পর্যন্ত নিজেদের মধ্যে ওরা আর কোনো কথা বলত না।

সোমেনই আমাকে প্রথম নিয়ে গিয়েছিল ওদের বাড়িতে। ওর মা আমাকে খুব স্নেহ করতেন। বাসায় ভালো রান্নাবান্না হলে সোমেনকে দিয়ে আমাকে খবর দিয়ে দুজনকে পাশাপাশি মেঝেতে বসিয়ে খাওয়াতেন। ওর ছোট বোন অবন্তী আমাদের এক ক্লাস নিচে—ক্লাস ফাইভে পড়ত। আমাদের খাবার সময় বড় বড় চোখে বিস্ময় ফুটিয়ে আমাদের স্কুলের গল্প শুনত অবন্তী।

বড় বড় কাঁসার থালার মাঝখানটায় উঁচু ঢিবির মতন ভাত বাড়া থাকত, চারপাশে ছোট ছোট বাটিতে নানা ধরনের মাছ, ডাল, নিরামিষ, শাক-সব্জি, দুধ আর মিষ্টির আয়োজন। ওর মা ছিলেন খুব হাসিখুশি আর স্নেহপ্রবণ। হাসতে হাসতে বলতেন, একেবারে নাড়ু

গোপালের মত চেহারা যে তোমার, একদম বামুনদের মত। তারপর হঠাৎ সোমেনের দিকে তাকিয়ে বলেই উঠতেন অবন্তীর সঙ্গে খুব মানাত, নারে সোমেন।

বোধহয় বার দুয়েক বলেছিলেন উনি কথাটা হাসতে হাসতে—তারপর যথারীতি ভুলে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি যত সহজে ভুলেছিলেন আমি অত সহজে ভুলতে পারি নি। অবন্তী আমার দিন-রাত্রির স্বপ্নের রাজকন্যা হয়ে গিয়েছিল।

সোমেনদের বাসার উল্টোদিকের ছোট্ট এক চিলতে একটা মাঠে আমরা এক বয়সের ছেলে-মেয়েরা বুড়ি-ছোঁয়া খেলতাম। একদিন খেলার ভেতর ওর হাত ছুঁয়ে আমার জীবনের নির্ভরশীলতার প্রথম অনুভূতিকে স্পর্শ করেছিলাম। খেলার সময় ফ্রকপরা অবন্তী মাঝে মাঝে চুলগুলোকে মাথার একপাশ দিয়ে পেছন টেনে নিয়ে সাদামাটা একটা হাতখোঁপা করে রাজকীয় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকত, সেই সময় ওকে রাণীর মত লাগত। মনে আছে শাড়ি পরে কুমারী পূজায় কুমারী হয়েছিল সেবার, মণ্ডপে ওকে প্রতিমার মত লেগেছিল। অবন্তীকে নিয়ে আমি একা একা স্বপ্ন দেখতাম। আমার জীবনের প্রথম স্বপ্ন অবন্তী।

শঙ্কুরা থাকত আমাদের বাসার কাছেই। একদিন সকালে আমাদের বাসায় এসে নিরুত্তাপভাবে খবর দিল : সোমেনরা কাল ইন্ডিয়া চলে গেছে। বোকা হয়ে গেলাম। হঠাৎ মনে হল যেন ওর কথাগুলো ঠিকমত বুঝতে পারি নি। উৎকণ্ঠিত গলায় বলে উঠলাম, 'কারা চলে গেছে?'

'আরে বাবা সোমেনরা। কাল রাতে গেছে। কেন, তোদের বলে নি কিছু আগে?'

ওর মুখে কেমন যেন একটা বাঁকা হাসির রেখা।

বুকের ভেতরটা নিদারুণভাবে মোচড় দিয়ে উঠল। শঙ্কু বিদায় হতেই সোমেনদের বাসার দিকে ছুট লাগালাম। কেবলই মনে হতে লাগল, কী করে সম্ভব এটা। পরশুর আগেরদিন বিকেলেও ওদের বাসায় অনেকক্ষণ ছিলাম। ওরা সবাই আন্তরিকভাবে কথা বলেছে। আচরণে-ব্যবহারে এতটুকু আলাদা মনে হয় নি কিছুই। যেন ঠিক আছে সব কিছুই, কোথাও ব্যতিক্রমের বিন্দুমাত্র লক্ষণ নেই। ফেরার সময় ওর মা আগের মতই মিষ্টি হেসে বলেছেন, 'আবার এস, কেমন!'

কার কাছে আসতে বলেছিলেন তিনি তবে আমাকে? অভিমানে আমার ঠোঁট ফুলে কান্না উপচে এল। সবচেয়ে অভিমান হল সোমেনের ওপর। নিশ্চয় জানত ও সবকিছু। এত অন্তরঙ্গতা ছিল ওদের সঙ্গে—কিছু না হোক একদিন পর ওরা চলে যাচ্ছে, এই কথাটা আমাকে জানাল না।

আর চাঁপা ফুলের মতো অবন্তী—সেই বড় বড় চোখের অপরূপ মেয়ে—ইচ্ছে মত যখন তখন যাকে দেখা যেতে পারত—হঠাৎ এক মুহূর্তে, অসম্ভব হয়ে কোথায় হারিয়ে গেল—তাকে, তাদের কাউকে এই দেশে কোথাও কোনদিন কোনোখানে আর দেখা যাবে না! ওদের এমন কেউ রইল না যাকে দেখে মনে করা যাকে অবন্তী তার ভেতরেও খানিকটা রয়ে গেছে। বুকের ভেতরটা শূন্যতায় শোকে একেবারে পাথরের মত হয়ে গেল।

ওদের চলে যাওয়া আমার পৃথিবীটাকে যে কতখানি খালি করে গেছে সেটা বুঝতে পারলাম যখন ওদের বাড়ির কাছে পৌঁছলাম তখন। রাস্তা দিয়ে আসার সময় মনের ভেতর কোথায় যেন একটা ক্ষীণ আশা ছিল : ওদের হয়ত দেখতে পাবো বাড়িটায়, সেই জমজমাট মুখর জীবনযাত্রার প্রাণবন্ত দৃশ্য কিছু না কিছু চোখে পড়বেই। কিন্তু বাড়ির কাছে

আসতেই বুকের ভেতরটা খা খা করে উঠল। ওদের পরিত্যক্ত বাড়িটা সম্পূর্ণ হতশ্রী হয়ে পড়ে আছে। কেবল অবন্তীদের ফেলে-যাওয়া ছোটখাট অদরকারী কিছু জিনিসপত্র, খেলনা, পুরনো বই, চুলের কাঁটা, ছেঁড়া কাগজ, এখানে সেখানে ছড়ানো-ছিটোনো। রাস্তা থেকে বাড়িতে ঢোকার মুখে ওদের সেই বিরাট ড্রইং রুমটার দিকে তাকিয়ে কান্না এসে গেল। বিশাল ঘরটা ক্ষুধার্তের মত হা করে আছে। ঘরটা খালি। ভেতরটা আবছা অন্ধকার। শোকেসে বুকশেল্‌ফে সোফায় জমজমাট ওদের সেই সরগরম ড্রইং রুমটার মিয়োনো অন্ধকারের ভেতর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে তাকিয়ে দেখতে পেলাম একটা কাঠের চৌকির ওপর গেঞ্জি গায়ে মোটাসোটা কালো মতো একটা লোক চুপচাপ বসে আমাদের দেখছে। তার চোখ মুখ দেখে বোঝা গেল হয়ত এইমাত্র ঘুম থেকে উঠেছে—সে-ই এখন এ বাড়ির নতুন মালিক।

হিন্দুরা চলে যেত এমনি নিঃশব্দে। সবার অজান্তে কারো কাছে জমিজমা বিক্রি করে, যাবার আগে গোপনে দখল বুঝিয়ে দিয়ে অলক্ষে চলে যেত। ঢাক-ঢোল পিটিয়ে সবাইকে বলে-কয়ে অশ্রুজলে বিদায় নেয়ার বিলাসিতার ভেতর নানারকম ঝুঁকি ছিল। সোমেনরাও তাই এমনি চুপচাপ চলে গিয়েছিল।

পিতৃ-পিতামহের জন্মভূমি, বাসস্থান, আশৈশবের পরিচিত পৃথিবী, আত্মীয়-বন্ধু, কৈশোর-যৌবনের মধুরতম স্মৃতি-স্বপ্ন, তুলসীতলা সবকিছু এইভাবে পেছনে ফেলে চলে যেত তাঁরা। তারপর জীবনের সেই অশ্রুময় অপরূপ স্মৃতিগুলোকে একা একা বয়ে চলত, বুকের ভেতর। সন্তানদের কাছে কাশবন-নদী আর সজীব মাটির স্বপ্নময় গল্প রূপকথার মতো শুনিয়ে যেত অবসর সময়ে, তারপর একসময় সবকিছুই নীরব হয়ে আসত।

১৪

আজ টের পাই সোমেনরা ব্রাহ্মণ হলেও খুব একট গোঁড়া ছিল না। নাহলে ঘরের ভেতর মেঝেতে একটা নির্জলা মুসলমান ছেলেকে বসিয়ে খাওয়ানোর ব্যাপারে ওদের পরিবারের আপত্তি থাকার কথা ছিল। আমি ঠিক জানি না খাওয়া-দাওয়ার পর আমার ব্যবহার করা থালাবাসনগুলোর ওপর কি পরিমান অত্যাচার-উৎপীড়ন চলত আর চললে নিগ্রহের পর বিশুদ্ধ গোবরে লণ্ডি-ধোলাই করে সেগুলোকে জাতে তোলার ব্যবস্থা কীভাবে হত। এসব কিছুই হওয়া অসম্ভব নয়, তবু সোমেনদের মধ্যে এমন একটা স্নিগ্ধ মানবিক উদারতা ছিল যা আমাকে সশ্রদ্ধ করত। আমি সবসময়ই দেখেছি মানুষের সঙ্গে মানুষের বিচ্ছিন্নতা যতটা অর্থনৈতিক ততটা ধর্মীয় বা বর্ণগত নয়। সোমেনদের আর আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থান ছিল প্রায় একই স্তরের। আমার মাঝে মাঝে মনে মনে প্রশ্ন জেগেছে ধর্মীয় ভিন্নতা সত্ত্বেও সোমেনরা আমাকে যতখানি ওদের ঘরের মানুষ করে নিতে পেরেছিল কোন গরিব হিন্দু পরিবারের ছেলেকে ততটা আপন করে নিতে পারত কিনা। তবু সোমেনের একটা ব্যবহার আমাকে ফিরে ফিরে কষ্ট দিত। আমি লক্ষ্য করতাম, আমাদের বাসায় পানি খাবার সময় সোমেন আমাদের গ্লাস মুখে ছোঁয়াত না, গ্লাসের পানি ওপর থেকে ঢেলে খেত। সোমেনকে এ নিয়ে প্রশ্ন করতাম না, কিন্তু কোথায় যেন নিজেদের অসম্মানিত আর ছোট মনে হত। বড় হয়ে বুঝেছি দোষটা সোমেনের ছিল না, ছিল ওর ধর্মের। না ঠিক ধর্মেরও নয় সামাজিক সংস্কারের। মানুষের উপর মানুষের শোষণকে চিরস্থায়ী করে রাখার উদ্দেশ্যে

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আচরিত এক চতুর সুচিন্তিত চক্রান্তের—যার উদ্দেশ্য সোমেন নিজেও জানত না। ওরা চলে যাবার পর জেনেছিলাম কেবল আমাদের বাসাতেই নয় ওর অন্যান্য হিন্দু বন্ধুদের বাড়িতেও, ব্রাহ্মণ না হলে, ও ওভাবেই পানি খেত।

১৫.

রাধানগর স্কুলে আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু ছিল অরুণ, অরুণকুমার ভট্টাচার্য। অরুণ ছিল ক্লাসের সেরা ছাত্র। ওর চাচাত ভাই প্রবোধও ছিল আমার বন্ধু। প্রবোধও ভাল ছাত্র, আমাদের ক্লাসেই পড়ত। ফর্সা স্নিগ্ধ চেহারার অরুণের প্রকৃতির মধ্যে কবিতার মত, স্নিগ্ধ কিছু ছিল। ওর সারা অস্তিত্ব জুড়ে সেই অতিন্দ্রিয় অনুভূতিলোকের আনাগোনা অনুভব করতাম। আমাদের মধ্যে কথাবার্তা যে খুব ঘটা করে চলত তা নয়, কথা ছাড়াও আমরা দুজন দুজনকে বুঝতে পারতাম। যখন শীতকালের কনকনে উত্তুরে হাওয়া বাংলাদেশের উপর দিয়ে ঘুরে ঘুরে সারাটা প্রকৃতিকে উজ্জ্বল আর কমনীয় করে তুলত তখন আমরা শুকিয়ে-আসা ইছামতীর শীর্ণ রুপোলি স্রোত পার হয়ে নদীর ওধারের দারুচিনি গাছটার নিচে বসে গাছপালার রহস্যময় বিষণ্ন শব্দ শুনতে ভালোবাসতাম। অরুণের মধ্যে একটা সরল, প্রখর সত্যপ্রিয়তা ছিল। একদিন আমাদের ক্লাসে একটা ছাগল হঠাৎ করে ঢুকে পড়ে। ছাগলটাকে দেখে স্যার সরব অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে যখন বলতে শুরু করলেন, দেখরে দেখ তোদের বন্ধু এসে গেছে তখন অরুণ রাগে লাল হয়ে যাওয়া মুখে এই অবমাননার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সরাসরি প্রতিবাদ জানিয়েছিল।

একদিন সন্ধ্যায় হঠাৎ অরুণ আমাদের বাসায় এসে উপস্থিত। ওর চোখের কোণায় পানি চিকচিক করছে। বললাম, 'কী ব্যাপার অরুণ?'

'আমরা ইণ্ডিয়া চলে যাচ্ছি।'

'কবে?

'কাউকে বল না, মাস খানেকের মধ্যে।'

অরুণ এমনিতেই কথা বলত কম, এরপরে একেবারে নিঃশব্দ হয়ে গেল। একেকসময় অনেকক্ষণ ধরে আমার দিকে অপলকভাবে তাকিয়ে থাকত, ওর চোখ তখন পানিতে টলমল করত।

সোমেনদের মত অরুণরাও চলে গেল এক রাত্রে, সবার অজান্তে, কাউকে না বলে। ওদের জিনিসপত্র গোছাবার জন্যে আমি অরুণের সঙ্গে কয়েকদিন একটানা ব্যস্ত হয়ে ছিলাম। তারপরেই সব শূন্য হয়ে গেল। ট্রেনে দর্শনা বর্ডার হয়ে কোলকাতায় চলে গেল ওরা। বাগেরহাট আমাদের দেশ। ট্রেনে বাগেরহাট যেতে হলে এই দর্শনা হয়েই যেতে হত। দর্শনায় গিয়ে আমাদের ট্রেন কোলকাতার রাস্তা ছেড়ে খুলনার রাস্তা ধরত। কোলকাতামুখি রেললাইনটা একটা গাছপালার রহস্যময় সরু জগতের ভেতর দিয়ে ভারতের দিকে চলে গেছে। সেদিকে তাকিয়ে কেবলই মনে হত এই সেই পথ যে পথ দিয়ে অরুণ চিরকালের জন্য চলে গেছে। রেলরাস্তার দুপাশের সারবাধা গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে মনে হত কী ভাগ্যবান ওরা। এই পথ দিয়ে অরুণকে চলে যেতে দেখেছে।

উনিশ শ পঞ্চাশ-একান্নর দিকে হিন্দুদের দেশত্যাগের হিড়িক যেন তুঙ্গে উঠল। চলে গেলেন আমাদের গৃহশিক্ষক সুরেশ লাহিড়ী। আমাদের কাছেই থাকতেন মহাদেব দা আর

তাঁর বিধবা বোন কাত্যায়নীদি। খুব স্নেহ করতেন আমাকে। একটা নমনীয় মাধুরী ছিল কাত্যায়নীদির মিষ্টি চেহারায়। মার্জিত শান্ত মানুষ ছিলেন মহাদেব দা। আমাকে একদিন নিমন্ত্রণ করে খাইয়েছিলেন তাঁরা। কাত্যায়নীদির রূপ আর রান্না দুই-ই ছিল অসামান্য। শাকসব্জী থেকে শুরু করে এত রকম খাবার এমন সুস্বাদু করে রান্না করেছিলেন কাত্যায়ানীদি আর এমন সস্নেহে সবকিছু খাইয়েছিলেন যে সেই খাবার স্মৃতিটা আজও একইরকম মনের পটে ঝলমলে হয়ে আছে। একদিন তাঁরাও চলে গেলেন। চলে গেলেন প্রফুল্ল বাবু, রাজীব উকিল, শ্রীশ অধিকারী। আমাদের বাসার পেছনে বিরাট বাগানওয়ালা বাড়ির জটুবাবুর মেয়ে ছিলেন বীণাদি। সোনার প্রতিমার মতো বীণাদিরাও চলে গেলেন একদিন। চলে গেল প্রবোধরাও। দেখতে দেখতে গেলেন আরো অনেকে–যাদের মধ্যে জীবনের সৌন্দর্য, মর্যাদা আর প্রেমের পৃথিবীকে খুঁজে পেয়েছিলাম একদিন। একটা নিঃস্ব নীরক্ত পৃথিবীর ভেতর নিজের শৈশবটাকে দেখতে পেলাম হঠাৎ করেই।

আজো এঁদের কেউ কেউ জীবনের সায়াহ্ন–বেলায় শৈশবে ফেলে যাওয়া সেই স্বপ্নগুলোকে দেখে যাবার জন্যে তাদের ছেলেবেলার বসত–বাড়ির ধারে ফিরে এসে একা একা ঘুরে বেড়ান। অনেক সময় তাঁদের সন্তানদের কেউ–কেউ বাপমায়ের কাছে শোনা আম জাম ইলিশ আর পাল–তোলা নৌকোয় ভরা তাদের আদি পিতৃভূমিকে দেখার জন্যে চলে আসে। এমনি বেশ কিছু স্বপ্নতাড়িত মানুষের সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার গত পনের–বিশ বছরে।

এইভাবে চলে গিয়েছিলেন সেকালের হিন্দুরা। চলে গিয়েছিলেন নিঃশব্দে, পরাজিতেরা যেমনিভাবে যায়, তেমনি। আমাদের স্বপ্নের প্রেমের পৃথিবীকে শূন্য করে তাদের সেই ভাষাহীন চলে যাওয়া আজও আমার জীবনের অন্যতম বিষাদময় ঘটনা।

১৯৯০

## অনিশ্চিত কালবেলায়

অনেক দিন আগের একটা ঘটনা। খুব সম্ভব শ্রাবণ মাস। সকাল থেকে বৃষ্টি শুরু হয়ে বিরতিহীন বর্ষণের পর বিকেলের দিকে ধরে এসেছে। দেখতে দেখতে চারধার তাতিয়ে রোদ উঠল। আমাদের একতলার বাসার বারান্দাটা, যেটা সারাদিন বৃষ্টিতে পড়ে পড়ে ভিজেছে, দেখলাম, রোদ উঠতেই আস্তে আস্তে শুকোতে শুরু করে দিয়েছে। দেখতে দেখতে বারান্দার নিচু দিকটা শুকিয়ে ঝরঝরে হয়ে গেল। বাকি অর্ধেক তখনো ভেজা। হঠাৎ দেখলাম একটা কেঁচো, কোথা থেকে উঠে এসে বারান্দার ভেজা অংশটার ধার ঘেঁষে আস্তে আস্তে এদিক থেকে ওদিকে এগিয়ে চলেছে। কেঁচোটার গতিবিধি দেখে একটু অবাকই হতে হল। দেখলাম বারান্দার ভেজা প্রান্তটা ঘেঁষেই শুধু কেঁচোটা এগিয়ে চলেছে। ভুল করে যখনই তার মাথাটা বারান্দার শুকনো দিকটায় চলে আসছে তখনই সে আবার শরীরটাকে লম্বা করে তড়িঘড়ি ভেজা দিকটার দিকে চলে যাচ্ছে। বুঝে ফেলছে ঐ শুকনো দিকটা তার জন্যে নয়, তার জীবনের জন্যে নয়, এই ভেজা দিকটাতেই তার অস্তিত্ব, তার সম্ভাবনা, তার উদ্ধার। একটা কেঁচো—যার মস্তিষ্ক নেই, চোখ-কান-নাক-জিহ্বা নেই, আছে কেবল একটা স্নায়ুতন্ত্র সেও কিন্তু সহজাত বোধের কাছ থেকেই জেনে যায় কোনটা তার পথ, কোনদিকে এগোতে হবে, কোন পৃথিবী তার বিকাশের অনুকূল, কোন জীবন স্বাস্থ্যপ্রদ। একটা কেঁচো যা বুঝতে পারে মানুষের মতো অমিত বুদ্ধিসম্পন্ন একটি জীবের তা বুঝতে না পারার কথা নয়। শিশু বয়স থেকেই আমরা যেমন টের পেয়ে যাই কখন আমাদের খাবার সময়, কখন খেলার, কখন ঘুমের, কখন স্বপ্নের তেমনি বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের টের না পাবার কোনো কারণ নেই যে আমাদের জীবনের অভীষ্ট কোনটা, কোথায় আনন্দ, কোথায় সার্থকতা, সম্পূর্ণতা কোনদিকে। কিন্তু মানুষের সঙ্গে অন্যান্য প্রাণীর একটা জায়গায় পার্থক্য আছে। মানুষের সমাজ আছে, অন্যান্য প্রাণীর নেই। এইজন্য একটা কেঁচো এক অর্থে মানুষের তুলনায় স্বাধীন। তার এই স্বাধীনতা নিরঙ্কুশ। এখানে সে সার্বভৌম। তার স্বাধীনতায় হাত দেবার কেউ নেই। সে কোনদিকে এগোবে, কোনদিকে এগোলে বাঁচবে, এসব সে যেমন নিজের ভেতর থেকেই অনুভব করে, তেমনি সেই পথে এগিয়ে যাবার ব্যাপারে নিজেই সে সিদ্ধান্ত নেয়। অন্যদিকে 'মানুষ স্বাধীন হয়ে জন্মায় কিন্তু চিরজীবন সে বেঁচে থাকে শৃঙ্খলিত অবস্থায়।' এর কারণ তার ভাই আছে, বন্ধু আছে, আত্মীয়-হিতার্থী আছে, সমাজ-সংসার আছে, সভ্যতা-সংস্কৃতি আছে। এরা সবাই মিলে তাকে বলে দেয়, সে কী করবে, কী তার পথ, কোথায় কোন পথে তার

মোক্ষ। এখানে তার ইচ্ছা সার্বভৌম নয়। এখানে সে কিছুটা তার নিজের, বাকিটা সমাজের, সংসারের, পরিপার্শ্বের।

কৃষণ চন্দরের একটা উপন্যাস আছে—নাম গাদ্দার। বইটার মধ্যে নায়ক বৈজনাথ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার তিক্ততম মুহূর্তে তার সঙ্গী কুকুরটাকে দুঃখ করে বলেছে, "তুই কোথায় যাবি? তোর পেটে বাচ্চা, তুই গাভীন, তুই কুকুর—তোর কোনো ভয় নেই। তুই কি মানুষ যে প্রাণের ভয় করছিস! এসব তো সভ্যতার উপকরণ—এই উঁচু সম্প্রদায় আর বর্ণের বিভেদ। এই তলোয়ার তো বিরাট সভ্যতা রক্ষার জন্য বানানো হয়েছে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দে যে এ অস্ত্রে তোর গলা কাটা হবে না—তুই তো সর্বশ্রেষ্ঠ বর্ণের জীব নোস্। শোকর কর তুই। তুই মজহাবের মানে জানিস্ না। তুই কখনো সন্ধ্যা আহ্নিক করিস নি, তুই স্বাধীনতার প্রয়োজন বুঝিস নি। তুই কখনো কোনো রাজনীতি করা নেতার বক্তৃতা শুনিস নি। শুকরিয়া জানা যে তুই কুকুর। মানুষ নোস্। যা, চলে যা। আসিস না আমার পেছনে। আমি মানুষ, আর মানুষের হাত থেকে বাঁচবার জন্য পালাচ্ছি। দূর হয়ে যা, চলে যা নিজের গ্রামে। সেখান থেকে আমায় তাড়িয়ে দিয়েছে, কিন্তু তোকে কেউ কিছু বলবে না। কেননা তুই একটা কুকুর, মানুষ নোস্। চলে যা তুই ঐ বাড়িতে।" না, কুকুরটা মরবে না। কারণ তার সমাজ সংস্কৃতি তাহজিব নেই। এই পৃথিবীতে সে একা। একা এবং সার্বভৌম। তার ইচ্ছা স্বাধীন এবং নিরঙ্কুশ।

কিন্তু আমি যে বিশেষ দেশের বিশেষ সমাজের মানুষ সেই সমাজের ভালো-মন্দ, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, স্বপ্ন ও কল্যাণবোধের কাছে আমি জিম্মি। এখানে কিছুটা ঘটে আমার নিজের ইচ্ছায় কিছুটা সমাজের নির্দেশে। ইসলাম ধর্মে একটা মূল্যবান কথা আছে। কথাটা হল—'মানুষ তার পিতার ধর্মে জন্মগ্রহণ করে, তারপর নিজের ধর্মগ্রহণ করে।' কিন্তু কথাটা কি সব মানুষের বেলায় খাটে? পৃথিবীর, সমাজের দশটা গতানুগতিক মানুষ কি পুরোপুরি নিজের অন্তরের ধর্মটি গ্রহণ করতে পারে? আমরা অধিকাংশ মানুষই তো আমাদের পিতার ধর্মে জন্মগ্রহণ করি এবং পিতার ধর্মের ভেতরেই জীবন কাটাই। নিজের ধর্ম গ্রহণের শক্তি কোথায় আমাদের? সংগ্রামের এত লড়াকু প্রাণনা আমাদের কোথায়? পিতার সেই ধর্মকেই—তার যাবতীয় প্রথা-সংস্কার-মূল্যবোধ শুদ্ধ মেনে নিয়ে খুশি হয়েই তো আমরা বেঁচে থাকি। একটা বৃহৎ গোষ্ঠীর সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন ভেবে নিরাপত্তা এবং শক্তি অনুভব করি। সমাজ সংসারের এই গতানুগতিকতা থেকে মুক্ত হতে পারে কয়জন? কয়জন সত্যিকারভাবে নিজের জন্য নিজের ধর্ম বেছে নিতে পারে। এটা পারেন শক্তি যাঁদের অপরিমেয় তাঁরা। গতানুগতিক পৃথিবীকে পাল্টে নতুন করে গড়ার অমানুষিক শক্তির যাঁরা অধিকারী তাঁরা। এটা পারেন হযরত মোহাম্মদ, বুদ্ধ, যীশুখৃস্ট, প্লেটো, এরিস্টটল, নিউটন, গ্যালিলিওর মতো অন্তহীন শক্তি এবং প্রতিভাসম্পন্ন মানুষেরা। কিন্তু আমরা যারা 'বাজারের পোকা কাটা জিনিসের কেনাকাটা করি' সেইসব ছাপোষা নিরীহ ভেদাভেদহীন মানুষেরা এটা কী করে করব। আমার শক্তি যত কম, পারিপার্শ্বিকের ইচ্ছা আমার ইচ্ছার ওপর ততবেশি জয়ী। আমার শক্তি যত বেশি আমি কী করব না করব সেটা তত বেশি আমার ইচ্ছাধীন। আমি যে পরিমাণে শক্তিমান সমাজ সংসারের প্রভাব আমার ওপর ঠিক সেই পরিমাণই কমে যায়। আমরা যখন খুব ছোট, জানি না কোনটা ভালো কোনটা মন্দ, অন্যায়-ন্যায়কে বুঝে, বিচার-বিবেচনা করে, চিরে চিরে যাচিয়ে গ্রহণ করার

ক্ষমতা যখনো আমাদের জন্মায় নি তখন থেকেই সমাজ তার ভালোমন্দের বোধটা আমাদের মনের ভিতর অল্প অল্প করে ঢুকিয়ে দিতে শুরু করে। চিন্তার দিক থেকে আমরা তখনো খুব দুর্বল। যেদিক থেকে যা আসছে আমরা পরীক্ষা বা পর্যালোচনা ছাড়াই আমাদের ভেতরে অপরিশোধিতভাবে নিয়ে নিচ্ছি। অপরিণত বয়সের এই অরক্ষিত অবস্থায় সমাজ আমাকে আমার করণীয় সম্বন্ধে যা বলে সেটাকেই আমি সাদামাঠাভাবে আমার নিয়তি হিসাবে মেনে নিই। পরে, বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে, যখন আমার বিচার ও মূল্যায়নের ক্ষমতা বাড়তে শুরু করে তখন ছেলেবেলায় সমাজের শেখানো মূল্যবোধগুলোকে আমরা দ্বিতীয়বারের মত মূল্যায়ন করতে বসি। এটা ঘটে আমাদের যৌবনে। আমরা দেখতে পাই ছেলেবেলায় আমার অসহায়তার সুযোগে সমাজ যা কিছু আমার ভেতর বুনে দিয়েছে তার অনেক কিছুই আমার প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বা জীবনের জন্য অনুকূল হয় নি। আমরা তখন ঐসব অগ্রহণযোগ্য ও অন্যায় ব্যাপারগুলো নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করি। এটা করি আমরা আমাদের শক্তির সর্বোচ্চ পর্যায়ে, যৌবনে। যৌবন সহজাতভাবেই আমাদের ভেতর এমন একটা অতিরিক্ত শক্তিকে জাগিয়ে তোলে যে শক্তিতে বলীয়ান হয়ে আমরা জীবনের সর্বোচ্চ সত্যকেও প্রশ্ন এবং অগ্রাহ্য করার স্পর্ধা দেখাতে দ্বিধা করি না। এরপর যখন আবার আমাদের বয়স বাড়তে শুরু করে, আমাদের রক্তের উষ্ণতায় ভাটা পড়ে, শক্তির পতন শুরু হয়, তখন আমরা আমাদের যৌবনে উত্থাপন করা এ সব দুঃসাহসিক প্রশ্নগুলোকে নিরীহের মত এক এক করে ফের পকেটে ঢুকিয়ে, সমাজ-সংসারের ভালোমন্দের বিচারগুলোর সামনে মাথা নুইয়ে, ঐ সমাজের গতানুগতিক ও একতরফা সিদ্ধান্তগুলোর কাছে পরিতৃপ্তি খুঁজে নিতে উৎসাহী হয়ে উঠি।

এটা ঘটে গতানুগতিক সব মানুষের জীবনে। গড়পড়তা মানুষের যৌবন নেহাতই একটা জৈবিক বিষয়, চৈতন্যিক নয়। বসন্তকালে গাছে যেমন ফুল ফোটে, ভাদ্রে যেমন নদী পরিপূর্ণ হয়, এও অনেকটা তেমনি। কিন্তু যারা উচ্চতর ও চেতনাবান মানুষ, যাদের যৌবন কেবল শরীর নির্ভর নয়, বোধি নির্ভর, জৈবিকভাবে বা দৈহিকভাবে যৌবন পেরিয়ে গেলেও দীর্ঘদিন ধরে এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত যৌবনের অদমিত দুঃসাহস যাদের ভেতর বেঁচে থাকে, তারা শুধু ঐ সব প্রচলিত মূল্যবোধ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন না, তাঁরা তাঁদের সেইসব অনুভূত সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সংগ্রামে নামেন। অধিকাংশ সময় মানুষের চিন্তাধারাকে পাল্টে দিয়ে এঁরা চেতনার নতুন পৃথিবী নির্মাণ করেন। কিন্তু সাধারণ ভেদাভেদহীন মানুষের জীবনে এমনটা হয় না। এই পৃথিবীতে আমি কী হব তা আর সবার মত আমার সমাজই শৈশবে কম বেশি ঠিক করে দেয়। ছেলেবেলার একটা স্মৃতি এখনো আমার মনে জ্বলজ্বলে হয়ে আছে। আমি যখন খুব ছোট তখন আমাদের বাসায় একজন গণক এসেছিলেন। আমার হাত দেখে তিনি বলেছিলেন সারা জীবন আমি টাকার ওপর গড়াগড়ি খাব। গণক মশাই হয়ত কথাটা পরের দিনই ভুলে গিয়েছিলেন। কেননা প্রতিদিন ঐ একই কথা তাঁকে অন্তত জনাপাঁচেক লোককে বলতে হত। কিন্তু আমি ভুলি নি। বহুদিন পর্যন্ত নিদ্রাহীন প্রদীপের মতো স্বপ্নে এবং জাগরণে তোষকের নিচে কড়কড়ে টাকার মচমচানি আমি নিজের কানে স্পষ্ট শুনতে পেয়েছি। আরেকটু যখন বড় হলাম তখন গণকের জায়গা নিলেন আমার মামা। ঐ একই কথা তিনিও বললেন। গণকের সঙ্গে মামার পার্থক্য এখানে যে কী করে কীভাবে কোন পথে এগোলে গড়াগড়ি খাবার মত টাকা আমি

হাতিয়ে নিতে পারব সেটা দেখিয়ে দিলেন তিনি। মামা বৃটিশ আমলে লন্ডনে ডক্টরেট করতে গিয়েছিলেন। সে সময় তিনি দেখেছিলেন বিলেতে চার্টার্ড একাউন্টেন্টরা সমাজে সম্মানিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত মানুষ। যেমন তাদের অর্থবিত্ত তেমনি প্রতিষ্ঠা–সম্মান। ঐ জীবন সব ঐহিক মানুষেরই কাম্য। তিনি আমাকেও চাটার্ড একাউন্টেন্ট বানিয়ে সমাজে আমার বৈভব এবং স্বীকৃতি দেখতে চেয়েছিলেন। মামার প্রেরণায় চাঙা হয়ে উঠতে শুরু করেছিলাম আমি। চার্টার্ড একাউন্টেন্ট হওয়ার স্বপ্ন দেখে ভবিষ্যতে নিজেকে একটা ভোগসর্বস্ব জীবনের ভিতর দেখতে ভালোবাসতে শুরু করেছিলাম। ফলে ম্যাট্রিক পাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই আমি তড়িঘড়ি বাণিজ্য বিভাগে ভর্তি হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমার এই উপাদেয় এবং পরিতৃপ্ত জীবনের দিকে এগিয়ে যাবার পথে বাধ সাধল দুটো জিনিস। আমার বয়স যখন ছয় সাত তখন থেকেই আমার বড় আপা সন্ধ্যার দিকে সঞ্চয়িতা থেকে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আমাদের সুর করে পড়ে শোনাতেন। তাঁর মুখে কবিতা শুনতে শুনতে রবীন্দ্রনাথের কবিতার শব্দ ও ছন্দের মাধুর্য এবং অনির্বচনীয়তা আমাকে অসহায়ভাবে আকুল কর তুলত। 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর' কবিতাটা আবৃত্তি করতে করতে যখন তিনি পড়তেন 'মন্দিরেতে কাঁসার ঘন্টা বাজলো ঢং ঢং' তখন আমি সন্ধ্যার অন্ধকারে কোনো লোকাতীত মন্দির থেকে উঠে–আসা বেদনার্ত ঘন্টাধ্বনির একটা সান্দ্র সুরকে নিঃসীম আকাশে কেঁপে কেঁপে মিলিয়ে যেতে দেখতে পেতাম। আমাদের বাসার কাছেই ছিল একটা ছোট্ট নদী। নদীর ওপাশে বিস্তীর্ণ চর। নদীটার দিকে তাকালেই সারা এলাকাটাকে আমার একটা রহস্যের দেশ বলে মনে হত। নদীর একধারে একটা ডুবে যাওয়া পানসি নৌকার খানিকটা অংশকে পানির ওপর জেগে থাকতে দেখে একটা দুঃখময় বাস্তব জাহাজডুবির বেদনা–বিধুর স্মৃতি আমাকে অকারণে ব্যথিত কর তুলত। আমার কেবলই মনে হত রূপকথার বাচ্চা হারানো সেই ভারাক্রান্ত কুমীর অশ্রুসজল চোখে সন্তান–ভক্ষণের প্রতিশোধ নেবার জন্যে ঐ চরের কোনো একখানে শেয়ালের ঠ্যাং কামড়ে ধরার জন্য মরার ভান করে ওঁত পেতে শুয়ে আছে। এক কথায় এমনি একটা অপরূপ স্বপ্নজগতের মধ্যে বেড়ে উঠেছিল আমার কৈশোর। আমি চারপাশের পৃথিবীকে বইয়ে পড়া রূপকথার জগৎ ধরে নিয়ে অবাক চোখে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকেছি। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আমার ভেতর এই স্বপ্নজগৎকে আমি আরো বেশি করে অনুভব করতে শুরু করলাম। ইস্কুলে দশম শ্রেণীতে যখন পড়ি তখন আমার বন্ধু খায়রুলের কাছে আমি কথায় কথায় একদিন একটা ভোরের বর্ণনা দিয়েছিলাম। বর্ণনাটা বোধহয় বেশ উজ্জ্বল আর স্নিগ্ধই লেগেছিল ওর কাছে। শুনে খায়রুল লেগেছিল এর কাছে, 'তোমার মধ্যে তো বেশ কবিতার প্রতিভা আছে দেখছি।'

ওর কথা শুনে আমার সারা অস্তিত্ব শিউরে উঠেছিল। আমার ভেতরে একটা কবি আছে জানতে পেরে অপার্থিব খুশিতে আমি ভরে গিয়েছিলাম। না, বৈজ্ঞানিকের–দার্শনিকের–ধনকুবেরের প্রতিভা নয়। কবির প্রতিভা। কী আশ্চর্য! কী অপার এই বিস্ময়! কবিতার দিকে আমার হৃদয় সব উজাড় করে উন্মুখ হয়ে পড়ল। আমি মাতালের মত কবিতা পড়তে শুরু করে দিলাম। কবিতায় পড়া এই পৃথিবীগুলোকে আমি অবাক হয়ে আমার চারপাশের বাড়ি–ঘর–গাছপালা–নদী আর মাঠের ভেতরে দেখতে পেতে লাগলাম। ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর পরই আব্বা আমাকে শেক্সপিয়রের নাটকগুলো পড়তে দিয়েছিলেন। আমি এসবের পাশাপাশি চসার, মিল্টন থেকে আরম্ভ করে তাবৎ ইংরেজ কবিদের কবিতার

বই খুঁজে নিয়ে পাগলের মত পড়তে শুরু করলাম। যে দুইজন কবি সবচে বেশি আমাকে স্বপ্নের জগতে নিয়ে গিয়েছিলেন, তারা ইংরেজি কবিতার অকাল প্রয়াত দুই তরুণ রোমান্টিক কবি শেলি আর কিটস। তাঁদের দুজনের নির্বাচিত কবিতার বইয়ে তাদের একটা করে ছবি ছিল। ছবিতে তাদের বিষণ্ন অনুভূতিপ্রবণ চোখগুলো চিরজীবনের জন্য আমার চেতনার সঙ্গী হয়ে গেল। তাদের বেদনাময় জীবন আমাকে দিনের পর দিন বিষণ্ন করে রাখতে শুরু করল। শেলির 'Ode to the west wind' কবিতা পড়ার পর আমি শীতের দুপুরে বনের ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ঠাণ্ডা উত্তুরে হাওয়ায় কেঁপে-ওঠা পাতার মর্মরধ্বনির ভেতর ইংল্যান্ডের শীতের জগৎকে অনুভব করতে শুরু করে দিলাম। কলেজের পাশে শিরীষ গাছের নিচে কালভার্টের ওপর দাঁড়িয়ে শীতের ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়ায় 'As you like it'-এর তুষার ঝরা কঠিন প্রকৃতির ছোঁয়া অনুভব করতে শুরু করলাম। চার্লস ল্যাম্ব, হাজলিট, এমারসন এবং কার্লাইলের লেখা আমাকে একটা কল্পনাময় বড় জীবনের দিকে আহ্বান করতে শুরু করল। কিটসের 'নাইটেঙ্গল' বা 'ওড টু অটাম' আমাকে শূন্য, নিঃসঙ্গ, নির্জন কল্পনা-রাজ্যের বাসিন্দা করে তুলল।

আমি টের পেলাম শিল্পের জগৎ আমার অনিবার্য নিয়তি হয়ে যাচ্ছে। সাহিত্যের সজীব প্রেরণা আমার সমস্ত অস্তিত্বকে অধিকার করে নিচ্ছে। আমি কবিতা লিখতে শুরু করলাম। কিন্তু অদ্ভুতভাবে একই সঙ্গে আবার এ-ও লক্ষ্য করতে লাগলাম যে কবিতা লিখলেও তার পাশাপাশি আর একটা আকুতি আমার হৃদয়কে একইরকম দুর্নিবারভাবে টানতে শুরু করেছে : সেটা হল পত্রিকা প্রকাশের ইচ্ছা। সেকালে আমাদের সুদূর মফঃস্বল শহরে ছাপাখানা থেকে আজকের মত পত্রিকা ছেপে বের করার কথা ছিল ভাবনার অতীত। সে সময় আমাদের পক্ষে যা একমাত্র সম্ভব ছিল তা হল দেয়ালপত্রিকা বের করা। আমি দেয়ালপত্রিকা বার করার কাজে মন দিলাম এবং পরপর তিনসংখ্যা দেয়ালপত্রিকা বেরও করে ফেললাম।

আজ এ কথা ভেবে আমার অবাক লাগে যে যখন আমার সারাটা হৃদয় কবিতার দরজায় আত্মবিস্মৃত প্রেমিকের মত নতজানু হয়ে ছিল—সে সময় দেয়াল পত্রিকা বের করার মত একটা বাস্তব-কঠিন সাংগঠনিক কাজে আগ্রহ আমার মধ্যে কী করে এল আর কেনই বা এল? এই প্রেরণার কোনো উৎস আমার সামনে বা চারপাশে কোনখানে কোথাও তো ছিল না। ছেলেবেলায় বিদ্যাসাগরের জীবনী পড়তে গিয়ে তাঁর অবিশ্বাস্য মাতৃভক্তি আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাঁর পরোপকার, মানুষের কল্যাণের জন্য তাঁর প্রগাঢ় জীবনপাত আমাকে ফিরে ফিরে তাঁর পথে ডাক দিয়েছে। একটা মানুষ চারপাশের মানুষদের গভীরভাবে ভালোবেসে তাদের ভালোর জন্য কীভাবে সারাটা জীবন উৎসর্গ করে দিতে পারে সেই পথ আমাকে ডাক দিত। বায়েজিদ বোস্তামির গ্লাসহাতে সারারাত মায়ের ঘুম ভাঙার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকার সেই কর্তব্য-ব্যথিত গল্প পড়তে পড়তে আমার চোখ উপচে অকারণে পানি এসে যেত। গৌতম বুদ্ধের বিলাস-বৈভব ছেড়ে নগ্নপদ ভিক্ষুর মত একবস্ত্রে বেরিয়ে যাওয়া, জাতির কল্যাণের জন্য সক্রেটিসের স্বেচ্ছায় বিষপানের গল্প বা সার্বিক বিপর্যয়ের হাত থেকে দেশকে বাঁচানোর জন্যে ঈশ্বরের আদেশে অশ্রুসিক্ত জোয়ান অব আর্কের জীবন দানের কাহিনী আমাকে বারে বারে হাত নেড়ে ডেকে যেত। চারপাশের মানুষের জন্যে আমার ছোট্ট জীবনটা দিয়ে সাধ্যমত কিছু করার নিঃশব্দ অঙ্গীকার আমার

অজান্তে স্কুলজীবনেই আমার ভেতর রচিত হয়ে গিয়েছিল।

আমি যখন কবিতা-সাহিত্য নিয়ে বিভোর তখনো আমারই মত অন্য সব তরুণ লেখকদের কথাও আমার কেবলই মনে হত। কেবলই মনে হত আমার নিজের লেখক হওয়াটাই একমাত্র কথা নয়। আমার চারপাশের যারা সৃষ্টির আনন্দে আমারই মত উন্মাতাল আর বিভোর হয়ে আছে আমার নিজের লেখার পাশাপাশি তাদের জন্যও আমার কিছু করণীয় আছে। চারপাশের লেখকদের জন্য এই দায়িত্ববোধ থেকেই ষাটের দশকের সূচনা লগ্নে বাংলাদেশের তরুণ লেখকদের নিয়ে নতুন সাহিত্য আন্দোলনের নেশায় আমি মেতে উঠেছিলাম। নতুন লেখকেরা যাতে নিজেদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পেতে পারে, সাহিত্য চেষ্টার ভেতর দিয়ে একটা মহৎ সাহিত্যকালকে নির্মাণ করতে পারে, তার জন্য আমি ক্ষান্তিহীন কাজ করে গেছি। জন্মগতভাবে আমি সংগঠক নই। একজন যোগ্য সংগঠকের প্রয়োজনীয় গুণের অনেক কিছুই আমার মধ্যে নেই। পরিশ্রমের সহজাত ক্ষমতা, সতর্ক পরিকল্পনা, ক্ষিপ্রতা, কর্ম প্রক্রিয়ার ওপর দীপ্র নিয়ন্ত্রণ—এমনি অনেক কিছুই নেই আমার মধ্যে যা সংগঠন গড়ে তোলার জন্যে খুবই জরুরি। আমি একজন অলস, কল্পনাপ্রবণ, স্বাপ্নিক, বন্ধুপ্রিয় আমুদে মানুষ। অলস গল্পগুজবের অলীক হুল্লোড়ে জীবন উড়িয়ে দেবার বেহিসেবি উৎসাহ আমার মধ্যে। কোনো প্রেরণায় পুরোপুরি অধিকৃত না হয়ে পড়লে আমি কাজ করতে পারি না। আমার পক্ষে কাজ করা সম্ভব হয় কেবল মত্ত অবস্থায়। কিন্তু চারপাশের যুগ ও জাতির প্রয়োজন ফিরে ফিরে আমাকে সংগঠনের দিকে টেনে আনতে লাগল। ষাটের সাহিত্য আন্দোলনের সঙ্গে আমি যখন জড়িয়ে ছিলাম তখন নিজের লেখাগুলোর দিকে আমি ভালো করে ফিরেও দেখি নি। 'কণ্ঠস্বর'-এর এক একটা সংখ্যা যখন বেরুত তখন সারা পত্রিকার প্রতিটা লেখা আমি বারে বারে ফিরে ফিরে পড়তাম। পড়তে পড়তে লেখাগুলো আমার মুখস্ত হয়ে যেত। প্রতিটা লেখাকেই মনে হত আমার নিজের লেখা। মনে হত আসছে, একটা বড়ো সম্ভাবনাময় মহান সাহিত্য-যুগ রচিত হচ্ছে এইসব অপরিণত, অসম্পূর্ণ, লেখার পায়ের চিহ্ন ধরে। চারপাশে এই উত্তাল সৃজন-উজ্জীবনের আয়োজন করতে গিয়ে নিজে যে আমি একেবারেই লিখছি না, অন্যদের সৃজনশীলতার বাসর রচনা করতে গিয়ে নিজেকে যে পুরোপুরি উপেক্ষা এমন কি খুন করে ফেলছি সে কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম একরকম।

ষাটের দশকের গোড়া থেকে সত্তরের মাঝামাঝি পর্যন্ত দীর্ঘ দশ বারো বছর গিয়েছিল নতুন সাহিত্য ধারার লেখকদের সহযোগিতা করে যাবার ব্যাপারে। আত্মবিস্মৃতের মত কেটে গিয়েছিল দিনগুলো। ঐ ফসলের যুগ শেষ হবার পর আমি টেলিভিশন নিয়ে মেতে উঠলাম। প্রথম দিকে টেলিভিশনে জড়িয়ে পড়েছিলাম নিজের সৃজনের আনন্দে। কিন্তু দর্শকদের ক্রমাগত ভালোবাসা টেলিভিশনের সঙ্গে আমার নিয়তিকে নিষ্কৃতিহীনভাবে জড়িয়ে ফেলতে শুরু করল।

আমি টেলিভিশনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলাম ষাটের দশকের মাঝামাঝির দিকে, বাংলাদেশ টেলিভিশন জন্মের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু, ঐ সময় থেকে সত্তর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত সাহিত্য আন্দোলনের ভেতর এমন মাতাল হয়ে জড়িয়ে ছিলাম যে টেলিভিশনের জীবন আমার কাছে খুব একটা বড় হয়ে ওঠে নি। সত্তরের মাঝামাঝিতে, উনিশশো তিয়াত্তর চুয়াত্তর সালের দিকে, আমি টেলিভিশনের নেশায় আকণ্ঠ হয়ে উঠি। এর একটা সরাসরি

কারণ ছিল। সব আন্দোলনের মত সাহিত্য আন্দোলনও ক্ষণস্থায়ী ব্যাপার। সাহিত্যকে একটা নতুন খাতে বইয়ে দিয়েই তার মৌসুম শেষ হয়ে যায়। আমাদের আন্দোলনও একদিন সাহিত্যকে নতুন পথে মোড় ফিরিয়ে নিজের আরাধ্য সাফল্যে ঝিকিয়ে উঠল। লেখকেরা নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিল। তাদের প্রাথমিক সংঘবদ্ধতার ভেতর শিথিলতা দেখা দিতে শুরু করল। দায়িত্ব সম্পন্ন হয়েছে বুঝে পত্রিকায় ঘোষণা দিয়ে আমি 'কণ্ঠস্বর' বন্ধ করে দিলাম। আমার হাতে তখন পর্যাপ্ত সময় এবং নির্জনতা। টেলিভিশন নিয়ে মাতাল থাকার মত পর্যাপ্ত। কিন্তু টেলিভিশন নিয়ে মেতে ওঠার কিছু দিনের মধ্যেই টের পেতে শুরু করলাম যে রূপালি পর্দার বিনোদনময় জীবনের সঙ্গে আমার শিক্ষক জীবনের একটা নিঃশব্দ নীরব বৈরিতা আছে। একজন শিক্ষকের ভাবমূর্তির সঙ্গে একজন উচ্ছল উপাস্থাপকের ভাবমূর্তিকে মেলাতে গিয়ে আমি অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়লাম। এই সময়কার একটা ঘটনার কথা আজও আমি ভুলতে পারি না।

উনিশশো তিয়াত্তর সালের দিকে আমি একটা নতুন বিনোদনমূলক সিরিজ শুরু করি। দেখতে দেখতে সিরিজটা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ফলে অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে উপস্থাপক হিসেবে নিজেকেও বর্ণাঢ্য ও জৌলুশপূর্ণ করে তোলার দরকার বেড়ে ওঠে। আমি সবসময় আমার চিরাচরিত পোশাক পাজামা-পাঞ্জাবি পরেই অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেছি, আজও তাই করি। টেলিভিশনের ঝলমলে জগতে এই পোশাক খুব একটা অভিনন্দিত নয়। সবাই আমাকে পোশাকের জৌলুস বাড়ানোর অনুরোধ করতে শুরু করে। এক পর্যায়ে আপোষমূলক ব্যবস্থা হিসেবে একদিন আমি কাঁধ এবং বুকের দিকটায় সাদা রঙের বুটি দেওয়া কড়া নীল রঙের একটা পাঞ্জাবী গায়ে দিয়ে অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করলাম। পরের দিন কলেজে গিয়ে এ নিয়ে আমাকে একটা বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হল। আমি কলেজের সিঁড়ি দিয়ে উঠছি। হঠাৎ একটা নিরীহ গোছের ছেলে আমার কাছে এসে নিচু স্বরে বলল, 'আপনার সঙ্গে কিছু কথা আছে।' আমি তাকে নিয়ে খানিকটা নিরালা জায়গায় গিয়ে তাকে তার কথা বলতে বললাম। সে সরাসরি আমাকে বলল, 'গতকাল টেলিভিশনের অনুষ্ঠানে আপনি একটা জমকালো পাঞ্জাবি পরেছিলেন।' আমি তার গলার স্বর থেকেই টের পেয়েছিলাম যে ব্যাপারটা তাকে ব্যথিত করেছে। আমি অপরাধীর মত তার অনুযোগ স্বীকার করে খানিকটা কৈফিয়তের সুরে বললাম 'টেলিভিশনের ব্যাপার তো, তাই একটু পড়তে হয়েছে আর কি।' সে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে শান্ত গলায় বলল, 'টেলিভিশন যদি আপনার কাছে অতটাই জরুরি হয়ে থাকে তাহলে টেলিভিশনেই থেকে যাবেন, কলেজে আসবেন না।' আমি তার কথায় সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়লাম। সে আরও কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'আপনার জন্য আমাদের সবার একটা অনুভূতি আছে। সেটাকে অপমান করার অধিকার আপনার নেই।' দেখলাম তার চোখের কোণায় পানি চিকচিক করছে। ছেলেটার কথায় আমি একেবারে ভেঙে পড়লাম। নিজেকে অসম্ভব অপমানিত এবং ছোট মনে হতে লাগল। নিজের ভেতর একটা তীব্র অপরাধবোধ আমাকে বিপর্যস্ত করতে লাগল। ঠিক করলাম টেলিভিশন ছেড়ে দেব। পরের দিন টেলিভিশনে গিয়ে অনুষ্ঠান করার ব্যাপারে আমার অপারগতার কথা কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে অনুষ্ঠানের ইতি টেনে চলে এলাম। কয়েক সপ্তাহ এমনিভাবে কাটল। একদিন সন্ধ্যায় নিউমার্কেটে একটা বইয়ের দোকানে গেছি বই কিনতে, হঠাৎ এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা। তিনি খেদের সঙ্গে

আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি আর টেলিভিশনে আসছেন না কেন?' আমি আমার অসুবিধা ব্যাখ্যা করে তাঁকে বললাম। তিনি বললেন আপনি তো আপনার অসুবিধার জন্য ছেড়ে দিয়েছেন, কিন্তু জানেন আমি এখনও প্রতি বুধবার রাত নটার সময় টেলিভিশনের সামনের বসে থাকি। মনে হয় আপনি আসবেন। আজ ছয় সাত সপ্তাহ ধরে এমনি বসে আছি।' হঠাৎ ভেতরে আমি একটা বড় রকমের ধাক্কা খেলাম। মনে হল পৃথিবীতে একজন লোকও তো অন্তত আছে যে আমার জন্য বসে থাকে, আমাকে দেখলে খুশি হয়। এমনও তো হতে পারে এই মানুষের সংখ্যা একজন নয়, অনেক। এত মানুষের এইসব খুশিও তো আমার বেঁচে থাকার একটা যুক্তি হতে পারে। পরের দিন আমি আবার টেলিভশনে গিয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে অনুষ্ঠান শুরু করার প্রস্তাব করলাম। চেষ্টা করতে লাগলাম আমার চিরাচরিত শিক্ষকের ভাবমূর্তিকে ব্যাহত না করে টেলিভিশনে অনুষ্ঠান করা যায় কিনা। একসময় টের পেলাম এই দুটো ভাবমূর্তিকে মিলিয়ে অনুষ্ঠান করা অসম্ভব নয়।

টেলিভিশনে অনুষ্ঠান করতে গিয়ে আমার নিজের ভেতর একটা সৃষ্টিশীল আনন্দের স্পন্দন আমি অনুভব করতে লাগলাম। আমার অনুষ্ঠান দিনের পর দিন প্রাণবন্ত আর আনন্দময় হয়ে উঠতে লাগল। যে শিল্পের জগতকে আমি একদিন বিদায় জানিয়ে চলে এসেছিলাম সেই শিল্পের জগত আমার ভেতর আবারও ধ্বনি-প্রতিধ্বনিময় হয়ে উঠল। জনপ্রিয়তার শীর্ষ পর্যায়ে, কয়েক বছরের মধ্যেই টিভি অনুষ্ঠানের জন্যে আমি সর্বোচ্চ পুরস্কার পেলাম। পুরস্কারের মানপত্রে লেখা ছিল আনন্দময় উপস্থাপনা এবং উন্নত কল্পনাশক্তির জন্য এই পুরস্কার দেয়া হচ্ছে। কিন্তু অনুষ্ঠানের ভেতর আমি যতটা সৃজনশীলতারই পরিচয় দিয়ে থাকি না কেন আজও আমার হৃদয়ের অন্তরতম জায়গাতে আমি জানি আসলে শুধু সৃজনশীলতার আনন্দের জন্যে ঐ অনুষ্ঠানগুলো আমি করি নি। আমি অনুষ্ঠানগুলো করেছিলাম দর্শকরা দেখে খুশি হবে বলে। তাদের প্রত্যাশা-পরিতৃপ্তিই ছিল আমার প্রেরণা। লক্ষ লক্ষ দর্শক আমার কাছ থেকে ভালো কিছু পাবার জন্য ঘরে ঘরে বসে আছে। আমি আমার আলস্য দিয়ে, অবহেলা দিয়ে কী করে তাদের শূন্য হাতে ফিরিয়ে দিই। যদি অনুষ্ঠানগুলোর ভেতর দিয়ে সত্যিকার সৃষ্টিশীল কিছু উপহার দিয়ে থাকি সেটা দিতে পেরেছিলাম হয়ত এ জন্য যে, সেদিন সেই সৃজনশীলতা আমার রক্তের কণায় কণায় উচ্চকিত ছিল। কিন্তু যে কারণে আমি সেদিন চাঁদে পাওয়া মানুষের মত আত্মবিস্মৃতভাবে অনুষ্ঠান করে গিয়েছিলাম সেটা আসলে ঐ সৃজনশীলতার জন্যে নয়, লক্ষ লক্ষ দর্শকের কাছে আমার হৃদয়ের দায়বদ্ধতার কারণে। অনুষ্ঠান করতে গিয়ে আমি যেভাবে সব কিছু ভুলে গিয়েছিলাম দর্শকরাও একই ভাবে সব ভুলে আমারই মত আনন্দ-মাতাল হয়ে উঠেছিল। গায়কে-শ্রোতায় মিল ঘটে গিয়েছিল একটা। আগেই বলেছি আমি এ সবই করেছিলাম দর্শকদের কথা ভেবে। তাদের জীবনের কিছু পলায়মান অর্থহীন মুহূর্তকে প্রাণোচ্ছলতায় ভরিয়ে দেবার তাগিদে।

টেলিভিশনের অনুষ্ঠানে আমার আত্মবিস্মৃত কাল কেটেছিল একটানা সাত-আট বছর। পৃথিবীর আর সব চাওয়া-পাওয়া, সব বাস্তবতা আমার কাছে থেকে এই সময় স্বপ্নের মত হারিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেই উন্মাদনাও একসময় আস্তে আস্তে থিতিয়ে গেল। টেলিভিশনকে আমার কাছে অর্থহীন মনে হতে লাগল। দেশের এবং জাতির এমন একটা দুঃখ এইসময় আমার হৃদয়কে অধিকার করতে লাগল টেলিভিশনের বর্ণিল জগতে যার

উত্তর নেই।

উনিশ শো একাত্তরে আমরা স্বাধীনতা পেলাম। স্পষ্ট টের পেলাম আমাদের সামনে এখন এক দীর্ঘ বিপুল নির্মাণের যুগ। সুযোগ্য, আত্মোৎসর্গীত, সংগ্রামী ও আলোকিত অসংখ্য মানুষ আজ চাই আমাদের এই জাতিকে নির্মাণের জন্য, এর নেতৃত্ব দেবার জন্যে। সব জাতির মধ্যেই এমনি কিছু শক্তিমান মানুষ সবসময়ই থাকতে হয় যাঁরা জাতিকে রক্ষা করেন, নির্মাণ করেন, সামনের দিকে নিয়ে যান, স্বপ্ন দেখান। সেই উচায়ত মানুষ কোথায় আমাদের ভেতর? অথচ এই মুহূর্তে পেতেই হবে তাদের বিপুল সংখ্যায়। এককে দশকে নয়, সহস্রে-লক্ষে। সেই সব মানুষ—যারা জাতির বেদনার এবং নিঃস্বতার যোগ্য প্রত্যুত্তর দেবে। দেশকে আর জাতিকে নির্মাণ করবে।

এইসব মানুষ আজ এদেশে জন্ম নেবে এমন পরিবেশ কোথাও নেই। গত কয়েক দশকের ভেতর দিয়ে আমাদের জাতির মূল্যবোধের সব বিখ্যাত প্রাসাদ এক এক করে ভেঙে পড়েছে। শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণ অবক্ষয়ী, সমাজ জীবন অরাজক। অবারিত দস্যুতার সামনে সমস্ত জাতি অশ্রুপাতরত। এ থেকে উজ্জ্বল উদ্ধার কোন পথে? আলোকিত মানুষ জন্মাতে পারে দুভাবে—পারিবারিক পরিবেশ থেকে আর জাতির সামগ্রিক শিক্ষা পরিবেশ থেকে। রবীন্দ্রনাথের মত মানুষেরা গতানুগতিক বিদ্যালয় থেকে জন্মলাভ করেন নি, জন্মেছিলেন এক সম্পন্ন ও ঐশ্বর্যময় পারিবারিক পরিমণ্ডল থেকে। তাঁদের গোটা পরিবারই ছিল একটা সম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয়। সেই বৈভবময় পরিবার আমাদের সমাজে কোথায় যেখান থেকে উত্থান ঘটবে উচ্চায়ত মানুষের? আজ আমাদের জাতির সূচনাপর্ব সবে শুরু হয়েছে। এখানে মহান আদর্শে উদ্দীপ্ত পরিবার কী করে প্রত্যাশা করব আমরা? পুরো শিক্ষাব্যবস্থা আজ ধুলায় মিশে গেছে। স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় মূল্যবোধ ও আত্মোৎসর্গের এমন সমৃদ্ধ পরিবেশ নেই যেখান থেকে জাতির সম্ভাবনাময় সন্তানেরা শক্তিমান হাত আকাশের দিকে উদ্যত করে দাঁড়াতে পারবে। অথচ এই পরাক্রান্ত মানুষদের পেতেই হবে আজ আমাদের মধ্যে এই জাতিকে নির্মাণের জন্যে। আমাদের জাতির ভেতর জ্ঞানের দৈন্যের বিষয়টি ষাটের দশকেই আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। ষাটের দশকের সাহিত্য আন্দোলনের ভেতর যে উষ্ণতা, উদ্দীপনা, সৌহার্দ্য ও শক্তিমত্তা বহমান ছিল, যে সংঘবদ্ধতা এবং সাহিত্য-লক্ষ্যের দিকে আমরা তরুণ্যের প্রাণ উন্মদনায় জেগে উঠেছিলাম তার শক্তি তিরিশের সাহিত্য আন্দোলনের চেয়ে কম ছিল না। প্রতিভার দিক থেকেও আমাদের শক্তির যোগান, গোটা প্রেক্ষাপটকে ধরলে, উপেক্ষণীয় নয়। কিন্তু একটা জায়গায় আমাদের ভাণ্ডার ছিল তাদের তুলনায় অপ্রতুল। সে এলাকা জ্ঞানের। জ্ঞানের শক্তিতে আমরা তাদের তুলনায় দীন ছিলাম। আমাদের প্রতিভার পর্যাপ্ত শক্তি সত্ত্বেও আমরা যে সমপরিমাণ সাফল্যে উজ্জ্বল হতে পারি নি এটা তার একটা কারণ। জ্ঞানের এই দৈন্য ঐ সময়ে আমাকে হতাশার ভেতর নিক্ষেপ করেছিল। আমার সহযাত্রী লেখকদের মধ্যে এই আকুতি জাগিয়ে তুলতে ব্যর্থ হয়ে আমি ঢাকা কলেজের কিছু উজ্জ্বল ছাত্র নিয়ে একটি পাঠচক্র শুরু করি। পাঠচক্রটি শুরু হয় উনিশশো আটষট্টি সনে। এর উদ্দেশ্য ছিল বহুমুখী : নানান জ্ঞানের সমন্বয়ে জীবনকে আলোকিত করে তোলা। বেশ কিছুদিন এই পাঠচক্রটি সক্রিয় ছিল। উনিশশো উনসত্তরের অভ্যুত্থানের পর দেশ ও জাতির অস্তিত্বের উৎকণ্ঠা বিপুল ক্ষুধায় জীবনের বাকি সব কিছুকে গ্রাস করে নিলে পাঠকচক্রটি

বিলুপ্ত হয়ে যায়। এই পাঠচক্রটি আজকের বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রথম অস্ফুট পূর্বসূরী।

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় সারা জাতির অস্তিত্বের সংকট তীব্রতম হয়ে ওঠে। সেই দুঃখ এবং অনিশ্চয়তার করুণ পরিবেশে দেশের মানুষের ভেতর যে অপূর্ব আত্মোৎসর্গ এবং শুভচেতনা জেগে উঠেছিল তার চেয়ে স্বর্গীয় দৃশ্য আমার জীবনে আর কখনও দেখি নি। প্রতিটি মানুষ ব্যক্তিগত সংকীর্ণতা কাটিয়ে দেশ ও জাতির জন্যে যেভাবে নিজের সবকিছু বিলিয়ে দিতে আকুল হয়ে উঠেছিল তেমনটি আমাদের জাতির আর কখন ঘটবে কে জানে। চারপাশে শুভত্বের সেই সর্বজনীন উদ্বোধনের ভেতর বসে আমি বিশ্বাস করতে ভালোবেসেছিলাম যে এই বিশুদ্ধ শুভচেতনা অর্থবহ নেতৃত্বের ভেতর দিয়ে একটা সম্পন্ন জাতির জন্ম ঘটাবে এই পৃথিবীর বুকে। যে হতাশাময় ভবিষ্যতের দৃশ্য ষাটের দশকের শেষের দিকে আমাকে বিষণ্নতার ভেতর ঠেলে দিয়েছিল তা থেকে পুরোপুরি মুক্ত হয়ে যেন ফুরফুরে হাওয়ায় বেঁচে উঠেছিলাম এই সময়। আমার চারপাশ অবারিত আলোর উজ্জ্বল চাঞ্চল্যে ভরে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল একটা মহান কাল এসে দাঁড়িয়েছে আমাদের সামনে, দেশের কোটি কোটি উদ্বুদ্ধ মানুষ তার রচয়িতা। বিশ্বাস করেছিলাম মানুষের এই জেগে ওঠার শক্তির ভেতর থেকে সহজভাবে নির্মিত হয়ে যাবে সবকিছু। উৎকণ্ঠিত হবার কিছু নেই। এইসব কোটি কোটি সোনার মানুষ আপনা থেকেই সোনার বাংলাকে রচনা করে নেবে। কিন্তু স্বাধীনতার পর সার্বিক অরাজকতা, অবক্ষয়, নেতৃত্বের ব্যর্থতা এবং স্বার্থান্বেষীদের বল্গাহীন অর্থলিপ্সার মুখে দেশের মানুষের সেই জেগে ওঠা শুভবুদ্ধি ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। মিথ্যা মোহ থেকে জেগে উঠে আমরা টের পেলাম আমাদের যে স্বাধীনতার সংগ্রামকে ভুল করে আমাদের জাতীয় সংগ্রামের শেষ যুদ্ধ বলে ধরে নিয়েছি, আসলে তা শেষ যুদ্ধ নয়, প্রথম যুদ্ধ মাত্র। যুদ্ধের সঙ্গে যুগ-যুগান্তর ধরে অপরিচয়ের কারণেই এমন ভুল ভাবনা ভাবতে পেরেছিলাম আমরা। আত্মস্থ হয়ে বুঝতে পারলাম, আমাদের এবারের যুদ্ধ সম্পূর্ণ নতুন এবং পরিচয়হীনতায় অস্পষ্ট। এবারের যুদ্ধ বাইরের শত্রুর সঙ্গে নয়, এযুদ্ধ আমাদেরই নিজেদের সঙ্গে। আমাদেরই ভেতরকার লোভ, পাপ এবং স্বার্থলিপ্সার সঙ্গে। এবার আমরা নিজেরাই আমাদের শত্রু। এই আত্মোপলব্ধিতে পুরোপুরিভাবে জেগে উঠে তৈরি হয়ে নিতে আমার সময় লেগে গেল সাত-আট বছর। বাইরের দিক থেকে টেলিভিশনের বর্ণিল জগৎ নিয়ে মেতে থাকলেও আমার ভেতরের নিভৃত মানুষটি একটি মহান জাতির স্বপ্নে আর্ত হয়ে রইল। এই আত্মোপলব্ধি আমার ভেতর নতুন পরিপূর্ণ রূপ পেলে হঠাৎ একদিন টেলিভিশনের জীবন থেকে পুরোপুরি বিদায় নিয়ে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র গড়ে তোলার কাজে উদয়াস্ত নিয়োজিত হয়ে গেলাম।

উনিশ শো একাত্তর সালের নভেম্বর মাসে পাকিস্তানী বাহিনী মুক্তিযোদ্ধা সন্দেহে আমাকে ধরে নিয়ে যায় এবং অমানুষিক নির্যাতন করে। মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার অধঘণ্টা আগে অলৌকিকভাবে আমি বেঁচে যাই। আমার সঙ্গের অন্যদের নারায়ণগঞ্জের কাছে ফতুল্লায় গুলি করে নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হয়। ঐ ঘটনা আমার জীবনকে পুরোপুরি পাল্টে দেয়। ঐ ঘটনার পর থেকে আমি মনে মনে ধরে নিয়েছিলাম যে আমি আর বেঁচে নেই! এখন থেকে আমার জীবন অন্যদের জন্য। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র গড়ে তোলার কাজে অংশ নিয়ে যে অমানুষিক শ্রম ও উন্মাদনার ভেতর নিশাহত মানুষের মত আমার জীবন কেটেছে সেই দুরূহ শ্রম দেওয়া সম্ভব হয়েছিল কেবল ঐ ছোট্ট অনুভূতিটুকুর জন্যেই। সারা

পৃথিবীর আর সবকিছুকে আমি ভুলে গিয়েছিলাম। একটি জ্বলন্ত শিখার দিকেই আমার দুই চোখ উদ্যত হয়ে জেগে ছিল তখন। সেই শিখার নাম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র।

আমি আগেই বলেছি জন্মগতভাবে আমি সংগঠক নই। আমি অনুভূতিশীল, কল্পনাচারী এবং স্বাপ্নিক প্রকৃতির মানুষ। মানুষের কল্যাণে জাগ্রত হবার জন্য যতটুকু স্বপ্ন এবং বিবেক-আক্রান্ত হৃদয় প্রয়োজন তা আমার মধ্যে রয়েছে। কিন্তু আমার ভেতরে অভাব রয়েছে বাস্তববোধের এবং সাংগঠনিক নেতৃত্বের। তবু ঐ এক পায়ে ভর করে অবিশ্রাম আমি ছুটে চলেছি। এই প্রতিষ্ঠানের স্বপ্ন আমাকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে এই পথের সমস্ত কষ্ট, অসম্মান এবং যন্ত্রণা-ভারাক্রান্ত জীবনকে আমি হাসিমুখে মেনে নিয়েছি। আজ বহুদূরে এগিয়ে এসে আমি টের পাচ্ছি, যে স্বপ্নের পেছনে আমি চন্দ্রাহত মানুষের মতন ছুটে এসেছিলাম সেই স্বপ্নকে সফল করে তোলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। একপায়ে দৌড়ে এত বড় একটা স্বপ্নের সামগ্রিকতা অর্জন করা যায় না। কিন্তু আমার অন্য যে পা সেটা যে সংগঠকের নয়, শিল্পীর। 'দুই পায়ে দুই দ্বিধা'—আমি কোনদিকে যাব?

ষাটের সাহিত্য আন্দোলন, টেলিভিশন এবং বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র আমাকে বিবেকে উদ্বুদ্ধ করে আমার শৈল্পিক জীবনের শ্রেষ্ঠ ও রক্তিম গোলাপগুলোকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। আমার জীবনে কোনো কাজকেই আমি প্রায় সম্পন্ন করতে পারি নি। জীবনের যে কটা দিকে আমি এগিয়েছি তার মধ্যে আমার ধারণা ষাটের সাহিত্য আন্দোলনে আমার দায়িত্বকেই আমি কেবল পূর্ণতা দিতে পেরেছিলাম। আমার টেলিভিশন-উপস্থাপনার জীবন পূর্ণতা পায় নি আরও বড় প্রয়োজনে তাকে অসম্পূর্ণ অবস্থায় ফেলে আসতে হয়েছিল বলে। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের স্বপ্নকেও পুরোপুরি সম্পন্নতা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয় আমার সমগ্র অস্তিত্বে আমি সংগঠক নই বলে। সাহিত্যের অঙ্গনে আমার শৈল্পিক চেতনাকে পূর্ণতা দেবার স্বপ্নও আজ দুরাশা মাত্র! কী করে পারব? আমার জীবনের শৈল্পিকভাবে উজ্জীবিত মুহূর্তগুলো যে ফুরিয়ে এসেছে, বয়স আর জরার আক্রমণে সৃজনশীলতা নিঃশেষিত। জীবনভর কাজ আর বিবেকের দায় আমার শিল্পকল্পনাকে এগোবার পথ দিয়েছে কোথায়?

জীবনের এই বিশাল ব্যর্থতা আর অসম্পূর্ণতার সামনে দাঁড়িয়ে আমি কোনদিকে যাব আজ? এই উদ্ধারহীন সংকটের ভেতর আমার সান্ত্বনা কোথায়? জীবনের বরাদ্দ আমার ক্ষয়ে এসেছে। আজকাল কেবলি মনে হচ্ছে নিরুপায় নিঃসহায় হ্যামলেটের মত আমি সেইখানেই দাঁড়িয়ে আছি যেখানে সামনে যাবার পথ অনেক, সব পথই উন্মুক্ত আর আহ্বানকারী, কেবল জানি না কোনটা সেই পথ।

১৯৯৪

## 'নীরব সঙ্ঘ' ও রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী

১

উনিশ শ' সাতান্ন থেকে আটান্ন সালের মাঝমাঝি সময়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সময়কার নবাগত ছাত্রদের এলোমেলো ভিড়ের ভেতর থেকে ধীরে ধীরে ঝিকিয়ে উঠল উৎসুক তরুণ জনকয় ছাত্রের একটি ছোট্ট মেধাবী দল। দলের নাম খানিকটা ব্যতিক্রমী—হয়ত অদ্ভুতই কিছুটা—'নীরব সঙ্ঘ'। দলের সদস্যদের সর্বসম্মত বক্তব্য একটিই :

"যা পূর্ণ তার ভাষা নীরব ; অপূর্ণতাই নিজেকে পূর্ণ বলে প্রকাশ করার জন্যে অহেতুক কলরব তুলে থাকে। এই পূর্ণতাই আমাদের লক্ষ্য, তাই আমরা নীরব। তাই আমাদের সংঘের নাম নীরব সংঘ।"

বিশ্ববিদ্যালয়ের নানান বিভাগ থেকে বিচ্ছিন্নভাবে এসে জড় হওয়া গুটিকয় ছাত্রের একটি আকস্মিক দল এটি—সভ্যেরা পাঠ্য বিষয়ের দিক থেকে পরস্পরের সঙ্গে অসম্পর্কিত—কিন্তু দলীয় চেতনার একটি মৌলিক বিন্দুতে এক : কিছু আলোকোজ্জ্বলতা, কিছু দীপ্রতাকে ছুঁয়ে যেতেই হবে, ঋদ্ধতর কিছুকে পেতেই হবে খুঁজে।

দলের নামটিকে আপাতদৃষ্টিতে পরিহাস-চটুল মনে হলেও একটু খতিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে নামটার হাল্‌কা ছদ্মাবরণের আড়ালে দলটি কীভাবে সে সময়কার ছাত্র সম্প্রদায়ের রুচি-গভীরতাহীন অন্তসার-শূন্যতার বিপরীতে তাদের আরাধ্য পূর্ণতার অবস্থানকে চিহ্নিত করে নিয়েছিল।

অল্পদিনের মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ের গতানুগতিক ছাত্র সম্প্রদায় থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন এই ছোট্ট সপ্রতিভ দলটি সবার চোখে আলাদা উজ্জ্বল হয়ে ধরা পড়ল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক অঙ্গন তখন পুরোদস্তর অবক্ষয়ী। বায়ান্নর উদ্দীপ্ত আন্দোলন খুব দূরস্মৃতি নয়, কিন্তু চুয়ান্নর যুক্তফ্রন্ট বিজয়ের পরবর্তী সময়ে প্রগতিশীল শক্তিগুলোর ক্রমবর্ধমান বিরোধ এবং অন্তর্কলহ দেশের রাজনৈতিক উদ্যমকে সার্বিক আশাভঙ্গের মধ্যে নিষ্ক্রিয় করে এনেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে তিন ধরনের ছাত্র তখন মোটামুটি রাজনৈতিক অঙ্গনে সক্রিয় (বিশ্ববিদ্যালয় রাজনীতিতে ছাত্রীদের ব্যাপক অংশগ্রহণ তখনো ঠিকমত শুরু হয় নি)। প্রথম দলে ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের কিছু তথাকথিত উজ্জ্বল ও মেধাবী ছাত্র। এরা কেবলমাত্র বিভিন্ন হল সংসদের নির্বাচনের সময় নানান পদে প্রার্থী হবার জন্য মুখিয়ে উঠত একমাত্র এ কারণে যে, এই সাংগঠনিক অভিজ্ঞতাকে সে সময়কার সি. এস. এস. পরীক্ষায় (সি, এস, পি হতে হলে যে

পরীক্ষা দিতে হত)* বিশেষ মূল্য দিয়ে দেখা হত।

প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনগুলোর সঙ্গে যারা যুক্ত ছিল তারা একধরনের মার্জিত চেহারার ছিমছাম তরুণ-তরুণী (অধিকাংশই সে সময়কার সুস্থিত মধ্যবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়ে) যারা চুটিয়ে দু-চারটা গণসংগীত বা রবীন্দ্রসংগীতের অনুষ্ঠান করতে পারাকেই মোটামুটিভাবে বিপ্লব ভেবে আত্মতুষ্টি পেত। রাজনীতি বা সংস্কৃতি চর্চা দুটোই, যতদূর অনুভব করতাম, তাদের কাছে ছিল একধরনের উঁচুস্তরের বিনোদন। সাধারণভাবে এদের মধ্যে প্রকৃত আত্মোৎসর্গের অভাব ছিল—পরবর্তীতে আমাদের দেশের বিখ্যাত সুবিধাবাদীদের অনেকেই এই দলের সদস্য। তৃতীয় দলে ছিল অর্ধধর্মাশ্রিত গ্রামীণ পটভূমি থেকে উত্থিত একধরনের উদ্যমশীল অকর্ষিত ছাত্রের দল—উচ্চাকাঙ্ক্ষী, রুচিহীন এবং সাধারণভাবে নীতিবোধশূন্য। এদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে উন্নত সংস্কৃতিরও একটি ক্ষীণ ধারা দেখা গিয়েছিল—যারা পরবর্তীতে বাংলাদেশ আন্দোলনে সক্রিয় নেতৃত্ব দিয়ে আরো পরে উপরোক্ত দলটির অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল।

এই তিনটি দলই সম্মিলিতভাবে (রাজনৈতিক এবং আমলাতান্ত্রিক) এখন এই জাতির ভাগ্যের ধারক।

নীরব সংঘের সদস্যদের ভাবনা-কামনার উজ্জ্বল বিন্দুটি চৈতন্যের যে সূক্ষ্ম শিখরে বিরাজ করত সেখান থেকে ছাত্ররাজনীতির এই অন্তসারশূন্য স্থূল পরিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল এবং সংগতভাবেই সে উৎসাহ তাদের মধ্যে একরকম দেখাও যায় নি। দলের সদস্যদের অবসর সময় প্রধানত সরগরম হয়ে থাকত নানান বিষয়ের ওপর উত্তেজিত বাক-বিতণ্ডায়। কাজটা সুস্থভাবে চালিয়ে যাবার জন্যে একটা নিরাপদ জায়গাও বেছে নিয়েছিল তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের একপ্রান্তে—শ্যাওলা-জমা এঁদো পুকুরটার উত্তর-পশ্চিম দিকের ছোট্ট একটা কোণে, আদর করে নিজেরাই এ জায়গাটার নাম রেখেছিল—ইডিয়টস কর্ণার। রুচিগত কারণেই মধুর ক্যান্টিনের দিকে মন ছিল না—এই এক চিলতে জায়গাই ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের একমাত্র নিজস্ব ভূ-খণ্ড। সহপাঠিনীদের মুখরোচক প্রসঙ্গ থেকে বিশ্বের সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে নির্জলা আড্ডা চলত সেখানে, কবিতা পড়া থেকে আরম্ভ করে দলের সর্বশেষ অভিযানের পরিকল্পনায় মুখর হয়ে থাকত জায়গাটা।

---

* এই সময়টা ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের জল-মেশানো উত্তরসূরী পরাক্রান্ত সি. এস. পি-দের মোটামুটি সুবর্ণযুগ। ইংরেজি ভাষার ঐ অক্ষর তিনটি তখন বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরের সমস্ত মেধাবী উচ্চাশী ছাত্রদের তাবৎ ঐহিক কামনার ইপ্সিত মধ্যমণি—একমাত্র আরাধ্য ও মোক্ষ। রাতারাতি অযাচিত পদমর্যাদা, সবরকম জাগতিক সুযোগ সুবিধা, নিরাপত্তা এবং বিপুল সামাজিক প্রতিপত্তির অপরিমেয় উৎস তখন এই রহস্যময় অক্ষর তিনটি। স্নিগ্ধ মাধুরী-রুচির চর্চার চেয়ে ঐ তিনটি অক্ষরের অধিকার যে জীবনের কাম্য গোলাপ শিকারের পক্ষে অনেক নিপুণ হাতিয়ার তা সেই সময়কার বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনের আকাশে-বাতাসে অনুরণিত কোনো অখ্যাত জীবন-রসিকের আত্মব্যঙ্গবিধুর পংক্তিমালায় বিধৃত :

ওগো কন্যে,
তোমার জন্যে
লিখব না আর কবিতা ;
মিথ্যা জানি সবই তা।
ওগো বড়লোকের ঝি
আমি হব সি. এস. পি॥

সংঘের সদস্যরা সময় কাটাত লাইব্রেরিতে পড়াশোনা করে, নিজেদের লেখার ওপর তুমুল প্রাণঘাতী আলোচনা চালিয়ে, বিভিন্ন হলের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় ঈর্ষাজনক সাফল্য লুটে এনে আর অসম্ভবের অসনাক্ত কোনো পিপাসায় প্রাণকোষের খাঁজে খাঁজে নিদ্রাহীন উন্মুখ থেকে।

২

মেধাবী কখনও ছিলাম না, 'পূর্ণতা'র ক্ষীণতম সম্ভাবনাও ছিল না চরিত্রে, তবু নীবর সংঘের গড়ে ওঠার ব্যাপারে প্রথম থেকেই সক্রিয় কাঁধ এগিয়ে দিয়েছিলাম।

এই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন ছিল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের বিশাল বাড়িটার দক্ষিণ দিকের অংশটা জুড়ে—প্রকাণ্ড উঁচু আর চওড়া একটা প্রলম্বিত দোতলা দালান। সামনের দিকে দীন আয়োজনে এবং সাময়িক ভিত্তিতে তৈরি টিনের চাল-ছাওয়া বেশ কিছু ক্লাসঘরের সারি, একটা এঁদো পুকুর এবং মধুর রেস্তোরাঁ—মোটামুটি এই নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ও বাণিজ্য বিভাগের বাস্তব ঘর-সংসার। মূল দালানের সামনে একটা হতশ্রী চেহারার আমগাছের নিচেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত রাজনৈতিক তৎপরতার উচ্চকিত প্রাণকেন্দ্র। অন্তত একটা কারণে গাছটা দীর্ঘকাল ধরে আমাদের জাতীয় ইতিহাসের অংশ হয়ে থাকবে। এই সেই আমতলা যে গাছের নিচে বায়ান্নর বিখ্যাত ভাষা আন্দোলন জন্ম নিয়েছিল। ফাল্গুন মাসে গাছটাতে অপর্যাপ্ত মুকুল আসত থরে থরে—সারাটা গাছ অপার্থিব সোনালি আভায় ভরে থাকত। মদির গন্ধে আমতলা মৌ মৌ করত কয়েকটা দিন। কিন্তু কোনদিন ঐ গাছে আম দেখেছি বলে মনে পড়ে না। বয়স্ক ছাত্রেরা তরুণ নবাগত ছাত্রদের জানাত : নেতা ফলাতে ফলাতেই গাছটার পরিত্রাহি অবস্থা, এর পর কী করে আর ফল দেয় বল।

ছোট্ট পরিচ্ছন্ন একটা আঙিনা নিয়ে ছোট্ট পরিপাটি আমাদের কলাভবন। নির্দয় স্মৃতি যখন পুরোনো দিনগুলোকে সামনে এনে দাঁড় করায় তখন ধারাল হাওয়ার মত নিষ্ঠুর দুঃখগুলো বুকের ভেতর ছুরি চালাতে থাকে। মাঝখানের হারিয়ে-যাওয়া এই তিরিশটা বছরকে মনে হয় অবাস্তব একরাশ উড়ো খবরের মত। মনে হয় এখনো যেন ঠিক তেমনি দাঁড়িয়ে আছি কলাভবনের সেই বিশাল গাড়ি-বারান্দাটার নিচে। চোখের পাপড়ির ওপর কচি স্বপ্নগুলো তেমনি ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে, শ্রদ্ধেয় শিক্ষকরা হেঁটে যাচ্ছেন, কার পায়ের শব্দ যেন পাশ থেকে চকিতে মিলিয়ে গেল, বন্ধুদের হল্লার শব্দ শোনা যাচ্ছে দূর থেকে, কে আসবে বলে সেই কখন থেকে যেন একঠায় অর্থহীন দাঁড়িয়ে আছি, আচমকা কার শাড়ির খশ খশ শব্দ বুকটাকে চমকে দিয়ে বিদায় নিল—এই সব।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই কলাভবন এখন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের দখলে। যেখানে আমাদের সবচেয়ে মদির দিনগুলো মুখরিত হয়েছিল, আমাদের কামনার প্রিয়তমারা তাদের ছোট্ট সুন্দর পা ফেলে হেঁটেছিল করিডোরে, রাস্তায়, সেখানে, সেই সব মৃত আকাঙ্ক্ষার লাশের ওপর এখন হাসপাতালের নোংরা বিছানা, ওষুধের গন্ধ, রোগীর আর্তনাদ সব কিছুকে মিথ্যা করে দাঁড়িয়ে আছে।

৩

দেখতে দেখতে যার ব্যক্তিত্ব দলের মধ্যে সবাইকে ছাপিয়ে উঁচু হয়ে দেখা দিল সে মোশতাক—কাজী মোশতাক হোসেন। সহজেই আমরা যেন তার নেতৃত্ব মেনে নিয়েছিলাম।

কেবল ব্যক্তিত্বে নয়, তার শালপ্রাংশু দীর্ঘ শরীর সবাইকে উচ্চাতায়ও ছাড়িয়ে ছিল—যেন তাকে অতিক্রম করে কিছুই চোখে পড়া প্রত্যাশিত নয়। লম্বা ঝুলের সাদামাঠা পাঞ্জাবী-পরা মোশতাকের চোখে ছিল পুরু লেন্সের চশমা। চশমার কাচের ভেতর দিয়ে ওর ভেতরকার সরল গভীর মানুষটাকে দেখা যেত।

যে ব্যাপারটার জন্য ও দলের সভ্যদের কাছে অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল তা হল ওর শান্ত পরিমিত ব্যক্তিত্ব। ও উৎসাহী হত শিশুদের মত, কিন্তু কাজ করত বুঝে-চিন্তে। শ্রীকান্তের কাছে ইন্দ্রনাথ যা ছিল মোশতাক আমাদের কাছে ছিল তা-ই। যৌবনের যে সব অসহায়তা, দুর্বলতা আমাদের প্রতিমুহূর্তে বিস্রস্ত করত—দুরপনেয় লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিত—সেই মানবিক ভ্রান্তিগুলো থেকে ও ছিল আশ্চর্যজনকভাবে মুক্ত। দলের সদস্যদের অস্থির ও বালখিল্যতার রাজ্যে ও ছিল নির্ভরশীল আশ্রয়। সবার পতন অসহায়তাকে মোশতাক সতর্কভাবে দুহাতে আগলে রাখত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় প্রতিটা হলের সাংস্কৃতিক সপ্তাহের বিতর্ক আর উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতাগুলোয় ভুরি ভুরি পুরস্কার বাগিয়ে যে নিয়মিত ঘরে ফিরত সে মওলা—মনজুরে মওলা, নীরব সংঘের অন্যতম প্রধান সদস্য।

মওলা মাঝে মাঝেই সুন্দর কবিতা পড়ে শোনাত আমাদের সাহিত্য আসরগুলোতে। প্রথম দিকে নীরব সংঘের একটা আসরে একটা চমৎকার কবিতা শুনিয়েছিল মওলা। কবিতাটায় ও বৃদ্ধ পিতার শুভ্র শ্মশ্রুর বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছিল—'বাতাসে ওড়া একখণ্ড শাদা কাগজ।' এখনো অদ্ভুত জ্বলজ্বলে হয়ে ছবিটা ভেসে আছে আমার মনে। বছর কয়েকের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের ওপর ওর একটা অনবদ্য কবিতা ওর কবিতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদের আশান্বিত করে তোলে।* পরবর্তীতেও অনেক অনবদ্য কবিতা লিখেছে

---

* **রবীন্দ্রনাথ**

নিজেই তো গোরা তুমি। ছ'ফুট শরীর ছায়া ফ্যালে
ছাড়িয়ে শালের বীথি, ফেলে শান্তিনিকেতন, ফেলে
জোড়াসাঁকো, পদ্মাতীর—ছায়া ফ্যালে বাংলার প্রাণে,
আমার হৃদয়ে দ্যাখ ছায়া কাঁপে, গলা শোনা যায়।
কত দূর দূরান্তর থেকে।

সব আছে, যথারীতি। লাবণ্য অমিত রায় রোজ
পাহাড়ে বেড়াতে যায়। সুচরিতা গান গায়। মিনি
সহসা বয়সে বাড়ে। কাবুলীওয়ালার মন কত
আশা নিরাশায় দোলে। দিন যায়।
ক্যামেলিয়া ফোটে।

সব আছে, যথারীতি। এবং তুমিও আছো, তুমি।
অথচ এখানে দ্যাখ জল নেই, এক ফোঁটা জল
পাবে না কোথাও খুঁজে। আকাশের বুক চিরে—নেই।
কেবল পাথর আর শূন্যতার খেলা, নদী নেই,
নেই, কিছু নেই।

সোনার তরীর গান লেখা আর হবে না কখনো।

ও, কিন্তু অল্প হলেও গদ্য লিখেছে অনবদ্যতর। সাম্প্রতিক কালে ও একটা বিরল সাফল্য দেখিয়েছে বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক হিসেবে। আঞ্চলিকতার স্থায়ী ছাপ-মারা একটা দীর্ঘদিনের গ্রাম্যতা থেকে বাঁচিয়ে, যে দীপ্র সাফল্যের সঙ্গে মওলা একটা জাতীয় প্রতিষ্ঠানের উজ্জ্বলতায় একাডেমীকে তুলে এনেছে তা সবারই সকৃতজ্ঞ অভিনন্দন পেয়েছে।

যাদের জীবনাবেগে নীরব সংঘের প্রাণধারা সজীব ছিল তাদের মধ্যে মনিরুজ্জামান একজন। প্রিয়দর্শন মনিরুজ্জামানের প্রকৃতির মধ্যেই কবিতার মত একটা লাবণ্য ছিল। কবিতা-গল্প ছাড়াও আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ জটিল ও ফুটনোট আকীর্ণ দুর্বোধ্য সব প্রবন্ধ লিখতো ও—পরবর্তীতে গবেষণায় ও যে অসাধারণ সাফল্য দেখাবে সম্ভবত তা আগে থেকে আমাদের হাড়ে হাড়ে টের পাইয়ে দেবার জন্যেই হয়ত। ওর দেশের বাড়ি ছিল ঢাকার কাছেই—আদিয়াবাদে—ট্রেনে যেতে ঘন্টা দেড়েক লাগত। মনে পড়ে প্রায় হঠাৎ করেই কেমনভাবে ওদের বাড়ির উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েছিলাম আমরা সবাই মিলে একদিন। প্রথমে ট্রেনে চড়ে, তারপর গাছপালার ভেতর দিয়ে পাখির ডাক শুনতে শুনতে হেঁটে বেড়ানো একটা ছায়াবহুল দিনের স্মৃতি এখনো চোখে ভাসে।

বুদ্ধিদীপ্ত মার্জিত পরিহাসপ্রিয়তা যার প্রায় প্রতিটা কথায় উপচে পড়ত সে আমাদের আতাউল—আতাউল হক। সে সময় যে চিহ্নিত দুচারজন ছাত্র নিজেদের গাড়িতে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসত সেই ঈর্ষিত ভাগ্যবানদের মধ্যে আতাউল একজন। তবে অন্যদের তুলনায় ওর ভাগ্যটা ছিল আর একটু দড়। ও কেবল গাড়ি চড়েই আসত না, চালাতও ও নিজেই। সে সময় অধ্যাপকদের কারোই প্রায় গাড়ি ছিল না। বাংলা বিভাগের বিখ্যাত মুনীর চৌধুরী, মুহম্মদ আবদুল হাই-এর মত বাঘা বাঘা অধ্যাপক নির্বিকার চিত্তে সাইকেলে 'প্যাডেল মেরেই' বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতেন। বিখ্যাত অবিখ্যাত প্রায় সব অধ্যাপকই আসতেন পায়ে হেঁটে, কখনো সখনো রিক্সায়। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের ভাবমূর্তি নিয়ে দাঁড়াবার জন্যে সে সময় একজন শিক্ষক তাঁর ব্যক্তিত্ব, পাণ্ডিত্য বা প্রতিভার ওপর নিঃসংশয়ভাবেই নির্ভর করতে পারতেন, এখনকার মত অধ্যাপক মহলের উপদলীয় শঠতার হীন নায়ক কিংবা হাল মডেলের দামি গাড়ির গর্বিত মালিক হওয়ার দায়ভার ঘাড়ে নেবার প্রয়োজন হত না।

আতাউলের গাড়িটা ছিল একটা ছিমছাম মার্জিত চেহারার মরিস মাইনর। পারিবারিক গাড়ি হলেও প্রায় সব সময়েই ওর কাছেই থাকত গাড়িটা। দেখতে না দেখতে নীলাভ ছাই রঙের ঐ ছোটখাট গাড়িটাই এই হৈ হৈ দলের প্রায় সর্বজনীন সম্পত্তি হয়ে দাঁড়াল। নতুন কিছু-একটা মাথায় এসে পড়েছে কি মুহূর্তে গাড়িটাতে চেপে বেরিয়ে পড় অভিযানে—কেউ বাধা দেবার নেই। যেতে হবে কোথাও দলবেঁধে, ভয় নেই, অনুগত গাড়ি তার প্রসন্ন ভঙ্গি নিয়ে একইভাবে প্রস্তুত। কয়েকটা বিচ্ছিন্ন হৃদয়কে পরস্পরের কাছে এনে একটা অভিন্ন আত্মায় পরিণত করার ব্যাপারে একটা নিরেট প্রাণহীন যন্ত্র যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে, ঐ গাড়িটা তার প্রমাণ। নীরব সংঘের সবচেয়ে তৎপর ও উপকারী সভ্য হিসেবে ঐ গাড়িটাকে ভোলা উচিত হবে না কারো আমাদের।

আতাউলের মধ্যে সব সময়েই একটা নিঃশব্দ উৎসাহ কাজ করত। যা আমাকে সবচেয়ে

বিস্মিত করত তা হল ঐ বয়স থেকেই (হয়ত আরো আগে থেকেই) আতাউল এ্যাপয়েন্টমেন্ট খাতা রাখত, ঘড়ি ধরে চলত এবং কখনো কোথাও আগে থেকে যাবার কথা ঠিক থাকলে আমাদের সবচেয়ে উৎসাহী অভিযানে যোগ দেবার প্রস্তাবও নির্মমভাবে নাকচ করে দিতে পারত। ঠিক প্রবৃত্তি-তাড়িত বলতে যা বোঝায়, আতাউল তেমনটা ছিল না। এই আপাত নীরবতার আড়ালে ওর ভেতরকার নিঃশব্দ উষ্ণ মানুষটি, সহৃদয় বন্ধুটি, আমার ধারণা, এখনো অনেকের কাছেই অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে।

কৈশোরিক স্নিগ্ধতা, উৎসাহ আর অজস্র প্রাণ-প্রাচুর্যে মুখর ছিল আনোয়ার—নীরব সংঘের সব উদ্দীপনার অন্যতম সজীব উৎস। পুলকে, শুধু অকারণ পুলকে জেগে ওঠা একটা প্রাণ যে একটা গোটা দলকে কেমন মাতিয়ে রাখতে পারে আনোয়ার ছিল তার প্রমাণ। এছাড়াও ছিল মেধাবী হাসান ইমাম, উৎসাহী হাসান, (মাহমুদুল হাসান) সূক্ষ্ম কৌতুকরস সম্পন্ন মাসুদ (নুরুউদ্দীন আহমদ আল মাসুদ), সাইফুদ্দিন (সাইফুদ্দিন আহমেদ) নীরব সংঘের প্রথম সদস্য যাকে কয়েকদিন আগে অপ্রত্যাশিত মর্মান্তিকভাবে আমরা হারিয়েছি—এমনি দলের চেতনাকে হালকাভাবে ছুঁয়ে-যাওয়া আরও অনেকে।

ছাত্র হিশেবে নীরব সংঘের সভ্যেরা প্রায় সবাই ছিল মেধাবী—সবাই প্রায় নিজ নিজ বিভাগের সেরা ছাত্র। এর স্বাভাবিক ফল ফলতে দেরি হয় নি। বিশ্ববিদ্যালয় শেষ হতে না হতেই ছাত্র সম্প্রদায়ের সে যুগের সেই কাম্য গোলাপ—সেই ইংরেজি অক্ষর তিনটির পেছনে—অনিবার্যভাবে, প্রায় ভূতগ্রস্তের মতন, ছুটে গিয়েছিল সংঘের অধিকাংশ সভ্য আর তাদের সহযাত্রী বন্ধুরা। কেউ কেউ অধ্যাপনার খাতায় নাম লেখাতে ছুটেছিল। বাকিরা অন্যান্য দিকে। সভ্যদের মেধা বিফলে যায় নি—উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠা জুটেছে প্রায় সবার জীবনে।

আতাউল, মওলা, আনোয়ার, সাইফুদ্দিন, মাসুদ হয়েছে বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় আমলা, মনিরুজ্জামান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, হাসান ব্যারিস্টার এবং এক পর্যায়ে রাষ্ট্রদূত, হাসান ইমাম আন্তর্জাতিক আমলা আর মোশতাক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন অধ্যাপনা করে সেই যে বিলেতে পাড়ি জমিয়েছিল, এখন পর্যন্ত ওখানেই রয়ে গেছে। আমাদের ছোট্টো সংঘটির উত্থান-পতনের বিত্তহীন ইতিহাসের মোটামুটি এখানেই সমাপ্তি। কয়েকটা দিনের কিছু বিচ্ছিন্ন স্মৃতি, চকিত কিছু মুহূর্তের সোনালি উদ্ভাস আর অন্ধকার। আর কিছু নয়, কোনো বৈভবই নয়। কিন্তু উদ্দীপিত তারুণ্যের সেই মদির দিনগুলোয় অসম্ভবের যে দুর্লভ স্বপ্ন সবাইকে উদগ্রীব করে আমাদের সামনে থেকে সে সময় মিলিয়ে গিয়েছিল তার আলোড়ন আজো থামল না।

৪.

প্রায় প্রতিদিনই আশা করছিলাম অভাবনীয় কিছু ঘটবে, কিন্তু তেমন কিছু ঘটার আদৌ কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। একবার সবাই মিলে ঠিক করলাম রেডিওতে যাব। সংঘের পক্ষ থেকে নিয়মিত অনুষ্ঠান করব সেখানে। এই অভাবিত দলের সরব পদপাতের খবরটা সবার কাছে জানাতেই হবে। পৌঁছাতেই হবে।

তখনও টেলিভিশন আসে নি এদেশে। সে সময় রেডিওই আমাদের কাছে টেলিভিশন।

রেডিও তখন প্রতি ঘরে প্রতিটা আঙিনায় শব্দিত উচ্চকিত একটা সরগরম ব্যাপার। ওটা একবার দখল করে ফেলতে পারলে আর কী চাই—কে ঠেকায় আমাদের।

কিন্তু রেডিও অফিসে দু-চার দিন ঘোরাঘুরি করেই বুঝলাম ওটা হবার নয়। এর জন্যে যে সব প্রাণঘাতী পরীক্ষার কথা শোনা গেল তা শুনে বুক শুকিয়ে উঠল। অগত্যা দল বেঁধে লেগে গেলাম ফররুখ আহমদকে সম্বর্ধনা দেবার আয়োজনে। কিন্তু যাঁকে এই সম্বর্ধনা তিনি নিজেই বেঁকে বসায় সে চেষ্টাও মোটামুটি মাঠেই মারা গেল। ফলে নিজেদের অভিমানী বিচ্ছিন্নতার জগতে হীন আত্মচর্চায় যখন অর্থহীন সময় কাটাচ্ছি, ঠিক সেই সময় হঠাৎ একটা সুযোগ—যোগ্য এবং বড়—দরোজায় এসে দাঁড়াল : রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী।

বড় এজন্যে যে প্রচলিত ঢঙে, গতানুগতিক আয়োজনে দেশজোড়া যে-সব নিম্নমানের রবীন্দ্রজয়ন্তী আয়োজিত হয়, কিংবা যেগুলো পালিত হয় আরও শ্রীহীন অমর্যাদার সঙ্গে—রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্তের মত তিনজন ভিন্নধর্মী এবং ভিন্নতলের কবির জন্মবার্ষিকী একই সঙ্গে একই মঞ্চের ওপর তিন ঘণ্টার মধ্যে শেষ করে দিয়ে—প্রত্যেককে সমানভাবে অপমানিত করে—তেমন সাধারণ কিছু নয় এটি। এ হল শতবর্ষের ফুল। শত পাপড়িতে প্রসারিত, শত আলোকধারায় প্রোজ্জ্বল। হ্যাঁ, কাঁধ এগিয়ে দেবার মত সত্যি সত্যি একটা বড় কাজ বটে। বড়, অনন্য এবং একক। আর যোগ্য এজন্যে যে কাজটা যেমন দায়িত্ব আর দুঃসাহসে ভরা, তেমনি বিপজ্জনক। কেন এত বিপজ্জনক এখানে তার সামান্য ব্যাখ্যা দিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

সময়টা তখন ১৯৬০ সালের শেষের দিক। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী হবে একষট্টির মে মাসে। এটা সেই সময় যখন সমস্ত দেশ আইয়ুব খানের কঠোর সামরিক শাসনের কবলে নির্মমভাবে শৃংখলিত। সমস্ত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা হয়েছে—প্রধান প্রধান নেতা ও কর্মীরা কারা প্রাচীরের অন্তরালে। এক কথায় স্বাধীন আত্মপ্রকাশের সবরকম অধিকার তখন নিরুদ্ধ ও পদদলিত। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং সভাসমিতির চত্বরগুলোর ওপর দাঁড়িয়ে আছে মৃত্যুর শীতল নীরব স্থবিরতা। 'গান বন্ধ কর তোরা নর্তকী নাচের মুদ্রা ভোল' (শামসুর রাহমান)—এরকম একটা ক্রুদ্ধ আদেশে সমস্ত সাংস্কৃতিক অঙ্গন ভীত এবং স্তব্ধ। জাতির হৃদয় শওকত ওসমানের ক্রীতদাসের হাসির কাফ্রি তাতারীর মতই মূক এবং স্থবির।

এরকম বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকীর উদ্যোগ নিতে যাওয়া যে কতখানি ঝুঁকির ব্যাপার তা আমরা সহজেই বুঝতে পেরেছিলাম। বাঙালি সংস্কৃতির যে অবদমন তৎকালীন পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর প্রধান লক্ষ্য রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকীর উদযাপন যে সেই প্রচেষ্টার প্রতি একটা সরাসরি প্রত্যাঘাত, তা তাঁরা ভালোভাবেই জানেন। কাজেই ব্যাপারটার পুরো দায়-দায়িত্ব জেনে বুঝেই কাজে এগোতে হল।

মনে আছে একদিন সন্ধ্যার দিকে মোশতাকদের বাসা 'খেলাঘর'-এর সামনে এলিফ্যান্ট রোডের পাশে দাঁড়িয়ে আমরা ঠিক করলাম, ঝুঁকি যতই হোক, দায়িত্ব নিতেই হবে। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম আমার স্বভাবসুলভ ধারায়—স্বপ্নতাড়িতের মতন ; মোশতাক সিদ্ধান্ত নিল সম্পূর্ণ সুচিন্তিতভাবে। আগেই বলেছি, মোশতাকের মধ্যে যৌবনের বালখিল্য প্রগলভতা কম ছিল—ও যা কিছু করত বুঝে-শুনে ভেবে-চিন্তেই করত। কিন্তু একবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললে ও ছিল শিশুর মতন একরোখা। চিন্তাভাবনা দিয়ে ও যদি একবার কোনো কিছু

ঠিক করত তবে তার জন্য যে কোনো মূল্য দিতে ও পিছপা হত না।

পরের দিন বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে মোশতাক আর আমি প্রথমেই তড়িঘড়ি দেখা করতে ছুটলাম বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই-এর সঙ্গে। সবার আগে তাঁর কথা মনে হয়েছিল দুটো কারণে। এক, তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যক্ষ। দুই, সে সময় ঢাকার সর্বাগ্রগণ্য রবীন্দ্রভক্তদের মধ্যে তিনি অন্যতম। কাজেই তাঁর কাছে আশ্রয়ের প্রত্যাশাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু দেশ যে তখন কী গভীর আতঙ্কের নিচে কুঁকড়ে আছে তা বুঝলাম অধ্যক্ষ হাইয়ের কাছে গিয়ে। আমাদের বক্তব্য শোনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি এমন প্রচণ্ড ধমকে উঠলেন যে আমরা হঠাৎ হকচকিয়েই গেলাম। তারপর তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার ক্রুদ্ধ আদেশ দিতে দিতে এই বলে আমাদের শাসিয়ে দিলেন যে এ ব্যাপারে তাঁর নাম যেন কোনভাবেই ব্যবহারের অপচেষ্টা আমরা না করি। সেদিন তাঁর এই রূঢ় আচরণে যার পর নাই হতাশ ও ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম, কিন্তু আজ যখন অনেক দূর থেকে সেই দিনগুলোর কথা স্মরণ করি আর মনে পড়ে প্রস্তাবটি উথাপনের সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাপক হাইয়ের মুখের উপর ভীত আশংকার আর্ত ছায়ারা কীভাবে নড়েচড়ে ফিরছিল তখন তাঁর সেই ব্যবহারকে অস্বাভাবিক মনে হয় না।

অধ্যক্ষ হাই-এর ঘর থেকে বের হয়ে মনে হল এভাবে হবে না। সময়টা সত্যিই খারাপ। কোনো একজন মানুষের কাছে গিয়ে লাভ নেই। মানুষ একা দুর্বল, একসঙ্গে হলেই তার শক্তি। সংঘবদ্ধ মানুষই দুর্লঙ্ঘ মানুষ। এখন যা কাজ তা হল সবাইকে নিয়ে সভা ডাকা। এমন বিরাট সম্মেলনের আয়োজন করা যেখানে মিলিত মানুষের বিপুল কণ্ঠ একসঙ্গে এমন উচ্চণ্ড হুঙ্কার তুলবে যা শুনে ভীত আতঙ্কগ্রস্ত শত্রুর দল লেজ তুলে পালিয়ে যাবে—'সিংহের হুঙ্কার উৎক্ষিপ্ত হরিৎ প্রান্তরের অজস্র জেব্রার মত'।

কিন্তু কোথায় হবে সভা, কার কাছ থেকে সাহায্য পাব? ডুবন্ত মানুষ প্রাণের জন্য খড়কুটোও আঁকড়ে ধরে। ছাঁৎ করে একজনের নাম আচমকাই মনে পড়ে গেল—ড. জি, সি, দেব (গোবিন্দ চন্দ্র দেব)।* তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যক্ষ, সেই সঙ্গে জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষ। বড় মাপের ব্যক্তিত্ব তিনি, তাঁর কাছে নিশ্চয়ই সাহায্য পাওয়া যাবে। দেরি করলাম না, সোজা ছুটলাম তাঁর বাড়ির দিকে।

ড. দেব তাঁর বাসায় সভা ডাকার ব্যাপারে মত দিলেন। উনি থাকতেন হলের প্রাধ্যক্ষের জন্য নির্ধারিত একটা পুরোনো একতলা গাছপালা-ঢাকা বাড়িতে। গেট দিয়ে ঢুকলেই হাতের বাঁ পাশে একটা কাঁঠালিচাঁপা গাছ—একটু খুঁজলেই কাঠালের তীব্র মিষ্টি গন্ধে ভরা দুয়েকটা ফোটা-আধফোটা ফুল পাওয়া যেত। বাড়িটা এখন ভেঙে ফেলা

---

* মেধাবী, বুদ্ধিদীপ্ত সুরসিক এবং প্রজ্ঞাবান ড. দেবের মধ্যে দার্শনিকতার একটা শরীরী রূপ চোখে পড়ত। চেহারায়, চলাফেরায়, জীবন যাপনে তিনি ছিলেন আপাদমস্তক দার্শনিক। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের রাখীবন্ধনের মধ্যেই দর্শনের সামগ্রিকতা—রাধাকৃষ্ণণের এই ভাবধারার সর্বশেষ একাগ্র উত্তরসাধকদের তিনি ছিলেন একজন। সেকালের এই ছোট্ট শহরটার আলোকপ্রত্যাশী মানুষদের মধ্যে দর্শনোৎসাহী গুটিকয় প্রখর নাস্তিককেও দেখেছি আমরা। এঁদের মধ্যে অধ্যাপক সাইদুর রহমান, জনাব আবুল হাসনাৎ, ড. ওয়াদুদ অন্যতম বিশ্বাসকে জীবনের প্রতিটা কাজে, আচরণে বক্তব্যে সততার সঙ্গে মূর্ত করে বেঁচে গিয়েছেন এঁরা। আমাদের জাতীয় চৈতন্যে মুক্তবুদ্ধির পতন ঘটে যাবার পর, মোটামুটি সত্তরের দশক থেকেই এই প্রোজ্জ্বল প্রজন্মের উত্তরসূরীরা বিলুপ্ত হয়ে গেছেন।

হয়েছে—এর অবস্থানটা ছিল জগন্নাথ হলের ঠিক বিপরীত দিকে মাঠের ওপাশটার চৌরাস্তার ধারেই—এখনকার বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাডেট কোর অফিসের পাশেই। এই বাড়িতেই উনিশ শ একাত্তরের পঁচিশে মার্চের রাত্রে পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাঁকে গুলি করে মেরে রেখে যায়।

আমরা দেরি করলাম না। বুদ্ধিজীবী-শিল্পী-সাহিত্যিক সাংবাদিকসহ বিভিন্ন পদ ও পেশার সব বিখ্যাত লোকদের নামের একটা লম্বা ফর্দ বানিয়ে তাদের আমন্ত্রণ করার জন্য লেগে গেলাম। সভার উদ্দেশ্য : রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন বিষয়ে প্রাথমিক আলোচনা। কয়েকদিন একটানা ছোটাছুটি দৌড়াদৌড়ি করে প্রায় সকলকেই যোগাযোগ করা হল। স্বতঃস্ফূর্ত সাড়াও দিলেন প্রায় সবাই। ঘন ঘন মাথা নেড়ে সমর্থনও করলেন এই মহৎ উদ্যোগের। ফলে বিরাট করে সভার আয়োজনে নেমে পড়তে হল। স্পষ্ট বোঝা গেল ড. দেবের ড্রয়িংরুমে এত বিপুল সংখ্যক অভ্যাগতের স্থান সংকুলান হবে—বাসার সামনের সবুজ লনটার ওপরেই সভার আয়োজন করা উচিত হবে। নানান জায়গা থেকে সাধ্যমত চেয়ার চেয়ে এনে গাদা করে রাখা হল লনের একপাশে। কিছু চেয়ার ডেকোরেটারের দোকান থেকেও এল। সবাই এসে পড়লে লনটাতেও জায়গা দেয়া যাবে কিনা এ নিয়েও দুর্ভাবনাগ্রস্ত হয়ে উঠলেন অনেকে। কিন্তু সভার সময় দেখা গেল নিমন্ত্রিতদের প্রায় সকলেই—একটা সফল চক্রান্তের নীরব অংশ হিশেবেই যেন—অনুপস্থিত। অভ্যাগতদের মধ্যে কিছু কলেজী ছাত্রছাত্রী এবং গৃহবধূকে দেখা গেল। সভাপতি ড. দেবকে দেখলাম অপরিসীম ধৈর্যের সঙ্গে ঐ অর্থহীন শ্রোতাদের কাছেই রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকীর গুরুত্ব তুলে ধরার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন। সভার শেষে মাথা নিচু করে চশমার ফাঁক দিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে তিনি এমন নিঃশব্দে বিদ্রূপমধুর হাসলেন যার অর্থ একটাই—কেমন হল তো? আমরা শ্রান্ত মনে ভারি শরীরটাকে কোনমতে টেনে দাঁড় করিয়ে চেয়ারগুলোকে জায়গামত ফেরত দেবার জন্যে বেরিয়ে পড়লাম।

দু'দুবার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে ঠিক হল যে এভাবে চলবে না—আরও চতুরভাবে এগোতে হবে। কাজ করতে হবে বাস্তব বুদ্ধি দিয়ে, সুস্থির পা ফেলে। এর জন্যে যদি মিথ্যা বা অন্যায়ের আশ্রয়ও নিতে হয়, তবে তাই সই।

ঠিক হল, প্রথমেই যেটা চটপট গঠন করে ফেলা দরকার সেটা হচ্ছে শতবর্ষ উদযাপনের আহ্বায়ক কমিটি। কিন্তু এই ত্রাসের রাজ্যে, এই সার্বিক নিরাপত্তাহীনতার ভেতর কে রাজি হবেন এই কমিটির সভাপতি হতে। কে স্বেচ্ছায় মাথায় নিতে চাইবেন এই বিপজ্জনক ঝুঁকি আর দায়িত্ব? কে হতে চাইবেন সাধারণ সম্পাদক? কারা কাঁধ এগিয়ে দেবেন সহ-সভাপতি বা অন্যান্য পদ গ্রহণের জন্য? সারা দেশ এখন অসুস্থ, স্তব্ধ। চারপাশে সবকিছু মৃত, নিষ্পত্র, ঊষর।

হঠাৎ আশার একটা ক্ষীণ আলো যেন ঝলকে উঠল দলের সদস্যদের সামনে। না আছে, আছে কেউ কেউ এখনো এদেশে। সর্বজয়ী ত্রাস এখনো সবাইকে নিষ্ক্রিয় করতে পারে নি। অনেকের মধ্যে অন্তত একজন এমন মানুষের কথা ভাবা যায়—অত্যন্ত দ্বিধাহীনভাবেই ভাবা যেতে পারে এই মুহূর্তে—তিনি বিচারপতি সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ। হ্যাঁ, সুযোগ্য, সর্বজনস্বীকৃতভাবেই তিনি অলংকৃত করতে পারেন রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী কমিটির

সভাপতির পদ। গতানুগতিক বুদ্ধিজীবীদের থেকে আলাদা, সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জগতের মানুষ তিনি—বিচারপতি হিশেবেও নিরপেক্ষ ভাবমূর্তির অধিকারী। তাঁর ব্যক্তিগত গুণপনা অনেক। সাহিত্য-দর্শনসহ জ্ঞানের অনেক শাখায় সুপণ্ডিত—সৎ এবং নিরাপোষ বক্তব্যের জন্য সর্বমহলে সম্মানিত। সম্পর্কসূত্রে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের ভাগনে তিনি এবং বিখ্যাত স্যার জাকারিয়ার জামাতা। বিচারপতি মোর্শেদ পারিবারিক ঐতিহ্যের কারণেও পাকিস্তানী শাসকদের কাছেও শ্রদ্ধেয়। ব্যাস, আর দেরি নয়। এখন যা করণীয় তা হল ঐ পদ গ্রহণ করার ব্যাপারে তাঁকে রাজি করানো। যেমন করেই হোক, যে ভাবেই হোক, সম্মত করাতেই হবে তাঁকে। স্বাভাবিক পথে না হলে ধূর্ততা বা কূটকৌশলের আশ্রয় নিয়ে হলেও তা করতে হবে। তাঁকে ছাড়া চলবে না কিছুতেই। কমিটিকে সত্যিকার অর্থে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা যাবে না। শতবার্ষিকী ভেঙে যাবে।

কমিটির সম্ভাব্য সাধারণ সম্পাদক হিসেবে যাঁর নাম চট করেই মনে এসে গিয়েছিল তিনি ড. খান সারওয়ার মুরশিদ—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের সুদর্শন অধ্যাপক। পরিচ্ছন্ন শিল্পরুচি, বৈদগ্ধ্য ও মার্জিত মননের অধিকারী ড. মুরশিদ চারুভাষিতা এবং সুস্মিত ব্যক্তিত্বের জন্য সবার প্রিয়। কিছুদিন আগেই তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে এবং নিরলস পরিশ্রমে পূর্ব পাকিস্তানের দশ বছরের সাহিত্যের ওপর কয়েকদিনব্যাপী এক বহুতলস্পর্শী সেমিনার-ক্রম আয়োজিত হয়ে গেছে। একবাক্যে তাঁর ব্যাপারে সবাই সমর্থন জানাল। সহ-সভাপতি হিসেবে ড. জি. সি দেবের নাম মুহূর্তে প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হয়ে গেল।

কিন্তু দেশের এই পরিস্থিতিতে এই কমিটির সভ্য হবার জন্যে তাঁরা কি সহজভাবে এগিয়ে আসবেন? আর কেনই বা আসবেন তাঁরা। কিন্তু ওসব ভাবলে আর চলবে না এখন। রাজি তাঁদেরকে করাতেই হবে। আগেই তো ঠিক করে নিয়েছি এর জন্যে প্রয়োজনে ছল-চাতুরি, মিথ্যা, কূটকৌশল—কোন কিছুর আশ্রয় গ্রহণেই পিছপা হওয়া যাবে না।

আমরা নিশ্চিন্ত ছিলাম এই ভেবে যে এই তিনজনকে যদি আমরা শতবার্ষিকী কমিটির ঐ তিনটি প্রধান পদে পেয়ে যাই তবে অন্য পদগুলো পূরণ করে নিতে কষ্ট হবে না। সুতরাং এখন যা করণীয় তা হল বুঝে-শুনে সতর্কতার সঙ্গে প্রকৃত উদ্দেশ্যের দিকে পা ফেলা।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে বিচারপতি মোর্শেদের কাছে পৌছানো যায় কীভাবে? উনি একেই বড় মানুষ—তাতে বিচারপতি অর্থাৎ খানিকটা জন-বিচ্ছিন্ন। হঠাৎ দলের কে একজন বলে উঠল, বিচারপতি মোর্শেদের একজন আত্মীয় তার চেনা—তাঁর মাধ্যমে দেখা অসম্ভব হবে না। একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলাম সবাই, ইউরেকা! তাহলে আমাদের ঠেকায় কে? হ্যাঁ, আশার আলো আছে বৈকি! কাজে নামলে, চেষ্টায় সৎ থাকলে, পথ একটা খুলে যায়ই।

চাতুরির প্রথম শিকার হলেন ড. খান সারওয়ার মুরশিদ। পরের দিন প্রথমেই আমরা তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম। পুরো চক্রান্তের নীল-নকশা আগে থেকেই ঠিক হয়ে গিয়েছিল, এখন দরকার এর সতর্ক ও সুষ্ঠু প্রয়োগ।

তাঁর সঙ্গে কথা বললাম মোশতাক আর আমি। প্রতিনিধি দলের মধ্যে মওলা আর আতাউলও ছিল। ওরা ইংরেজির ছাত্র। সুতরাং বিভাগীয় অধ্যাপকের প্রতি ভক্তির

নিদর্শনস্বরূপ খানিকটা পেছনে দাঁড়িয়ে চুপচাপ উপস্থিতির দ্বারা সমর্থন যুগিয়ে যেতে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষকের সঙ্গে শুরু হল আমাদের সরাসরি মিথ্যার পর্ব। সোজা বললাম, রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কাজের প্রাথমিক পর্ব চলছে। উদযাপন কমিটি গঠনের কাজও খানিকটা এগিয়েছে। বিচরাপতি মোর্শেদ সভাপতি হতে রাজি হয়েছেন। আপনি সাধারণ সম্পাদক হতে রাজি হলে আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ শুরু করা যায়।

বিচারপতি মোর্শেদের রাজি হওয়া তো দূরের কথা, তাঁর সঙ্গে দেখা যে কবে হবে তারই কিছু ঠিক নেই, আদৌ দেখা হবে কিনা তাও সন্দেহজনক, অথচ অকপটে ডঃ মুরশিদকে বলে ফেললাম কথাগুলো। মানুষ এমনি করে। এভাবেই ডুবন্ত মানুষ বেঁচে থাকতে চায় খড়কুটো আঁকড়ে ধরে, নির্বোধও এমন জায়গায় নির্বিকারে চলে যায় যেখানে দেবদূতেরা যেতে ভয় পায়। কোন আশাই নেই, তবু বুকের ভেতর কে যেন আশ্বাস দিয়ে যায় : হবেই।

প্রস্তাব শুনে ড. মুরশিদ হঠাৎ করে গম্ভীর হয়ে গেলেন, তারপর কিছুক্ষণ ভেবে বললেন, একটু ভেবে নিতে চাই। কাল উত্তর দেব।

দায়িত্বের বিপজ্জনক দিকটা কারো অজানা ছিল না। দেশের এমন অবস্থায় তাঁর সময় নেবার এই ব্যাপারটা নেহায়েৎ স্বাভাবিক। তাছাড়া একজন দায়িত্বশীল মানুষ হিসেবে সবদিক না ভেবে কোনকিছুতে রাজি হয়ে যাওয়াও সঙ্গত নয়। কিন্তু ব্যাপারটা মুহূর্তে আমাদের ভীত করে তুলল। যদি এই একদিনের মধ্যে ড. মুরশিদ বিচারপতি মোর্শেদের সঙ্গে যোগাযোগ করে বসেন? ফোনে কথা বলে সব কিছু জেনে যান? ভয়ে শিউরে উঠতে লাগলাম। ভরসা কেবল এই, আমরা সবাই তাঁর প্রিয় ছাত্র। এতটা সন্দেহ আমাদের হয়ত তিনি করবেন না।

আমি জানি ঘটনাটা যদি আজকে ঘটত তবে নিশ্চয়ই তিনি এই ন্যূনতম যোগাযোগটুকু করতেনই। ছাত্র হিসেবে যত প্রিয়ই আমরা হই ঘটনার সত্যতা-যথার্থতা যাচিয়ে-খতিয়ে না দেখে কিছুতেই তিনি এগোতেন না। নিজের বিপদের দিকটা নিয়ে ভাবতে চাইতেন। কিন্তু ড. মুরশিদ আমাদের প্রত্যেকটা কথাকে অকপটে বিশ্বাস করে নিলেন। আজকের তুলনায় সেটা ছিল অনেক বেশি বিশ্বাসের যুগ। অন্যের কাছে প্রতিনিয়ত ঘা খেয়ে প্রতারিত হয়ে মানুষের হৃদয় তখনো আজকের মত এতটা মুখ পড়িয়ে নি।

পরের দিন ড. মুরশিদ সাধারণ সম্পাদকের পদ গ্রহণে তার সম্মতির কথা আমাদের জানালেন। আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। ড. মুরশিদকে যেদিন প্রস্তাব করেছিলাম সেদিন বিকেলেই একই মিথ্যার পুনরাবৃত্তি করে ড. দেবকে কমিটির সহ-সভাপতি হবার অনুরোধ জানিয়েছিলাম। তিনি আগে থেকেই আমাদের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। কাজেই তাঁর কাছে মিথ্যাটা হল আরও এক প্রস্থ বড়। তাঁকে বলতে হল বিচারপতি মোর্শেদ এবং ড. খান সারওয়ার মুরশিদ যথাক্রমে কমিটির সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক হতে রাজি হয়েছেন। তিনি সহ-সভাপতি হলে ভালো হয়। প্রস্তাবমাত্র তিনি সম্মতি দিয়েছিলেন। আমাদের বুকের ভার আরও নেমে গিয়েছিল।

এখন আমাদের শেষ ও প্রধান লক্ষ্যবস্তু বিচারপতি মোর্শেদ। কেবল প্রধান নয়,

অনিবার্য। রাজি তাঁকে করাতেই হবে। কিন্তু না হলে? তার সম্ভাবনাই তো শতকরা নিরানব্বই ভাগ। নাঃ, আর ভাবা যায় না। আমাদের ধাপ্পাবাজি ধরা পড়ে যাবে—মুখোশ খুলে পড়বে—আর সব্বার সামনে আমাদের সাকুল্যে যে সুনামটুকু আছে, তা? থাক সে সব কথা!

সৌভাগ্যবশত বিচরাপতি মোর্শেদ দুদিন পরেই তাঁর সঙ্গে দেখা করার সময় দিলেন আমাদের। উৎসাহে লাফিয়ে উঠলাম সবাই। একটা আশার ঝলক খেলে গেল চোখের সামনে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'জীবনের পিছে মরণ ছুটিছে আশার পিছনে ভয়'-এর মতই আমাদের অবস্থা একই সঙ্গে শোচনীয়। যদি তিনি রাজি না হন, আমাদের কথাবার্তাকে বালখিল্যের প্রলাপ বলে উড়িয়ে দেন, আমাদের মত নামগোত্রহীন গুটিকয় ছাত্র কতটুকুই বা প্রভাব খাটাতে পারবে তাঁর ওপর। তীরে এসে তরী ডুবে যাবে।

নিজেদের বুকের ভেতরকার ঢিপঢিপ শব্দ শুনতে শুনতে একদিন দল বেঁধে বিচারপতি মোর্শেদের বাসায় হাজির হলাম।

ড. মুরশিদ এবং ড. দেবের কাছে আমাদের মিথ্যাকথা বলতে হয়েছিল বিচরাপতি মোর্শেদের কাছে মিথ্যা কথা বলার হাত থেকে বাঁচার জন্য। ড. মুরশিদ বা ড. দেব দুজনের কারো সঙ্গেই মিথ্যা বলার মত সম্পর্ক নয়—দুজনকেই আমরা শ্রদ্ধা করি। তবু তাঁদের সঙ্গে যে মিথ্যাচার আমরা করতে পেরেছিলাম, তার কারণ, হৃদয়ের ভেতর আমরা জানতাম তাঁরা আমাদের কাছের মানুষ, আমাদের শিক্ষক। অপরাধ করে ক্ষমা চাইলে, তাঁরা ফিরিয়ে দিতে পারবেন না। কিন্তু বিচরাপতি দূরের মানুষ, তাঁর সঙ্গে মিথ্যার অবকাশ নেই।

বিচারপতি মোর্শেদ থাকতেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরেই একটা পুরোনো লাল দোতলা বাড়িতে—সলিমুল্লাহ হল, বৃটিশ কাউন্সিল আর জগন্নাথ হলের মাঝখানটায় একটা সবুজ তিনকোণা জায়গার ওপর বাড়িটা। (বাড়িটা সম্প্রতি ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।) বিরাট এলাকা জুড়ে সবুজ গাছপালায় ছাওয়া একটা বাড়ি—চারপাশে বাড়ি ছাড়িয়ে অনেকদূর পর্যন্ত পাখি-ডাকা সবুজ গাছপালার জগৎ। ১৯০৫ সালে ঢাকা রাজধানী হয়ে যাবার পর মন্ত্রীদের থাকার জন্য রমনার সবুজ এলাকায় বিরাট বিরাট জায়গা জুড়ে যে সব লাল রঙের দোতলা বাড়ি তৈরি হয়েছিল, এটি তারই একটি।

গেট দিয়ে ঢুকেই বাড়ির বসার ঘরে গিয়ে হাজির হলাম আমরা। বাড়িটার পরিচ্ছন্নতা এবং পারিপাট্য চোখে পড়ার মত। দোতলায় বিচরাপতি মোর্শেদের ঘরে ডাক পড়ল আমাদের। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে দেয়ালে বিচরাপতি মোর্শেদের স্ত্রীর ছবি দেখলাম। রূপের খ্যাতিতে তাঁর স্ত্রী তখন ঢাকা শহরের কিংবদন্তী। কলকাতার স্যার জাকারিয়ার একমাত্র মেয়ে তিনি।

বিচরাপতি মোর্শেদের সঙ্গে অনেক কথা হল। আলোচনার মাঝামাঝি সময়ে মোর্শেদ গৃহিনীও এদিক ঘুরে গেলেন। মিষ্টি হেসে দুয়েকটা কথাও বললেন আমাদের সঙ্গে। সত্যি, অসামান্য রূপসী তিনি।

বিচারপতির কাছে মিথ্যা বলার কিছু ছিল না। রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী কমিটির প্রসঙ্গ তুলে তাঁকে জানালাম যে ড. মুরশিদ এবং ড. দেব যথাক্রমে সাধারণ সম্পাদক এবং সহ-সভাপতি হতে রাজি আছেন—তিনি সভাপতি হতে রাজি হলে কমিটি গঠিত হয়ে

যেতে পারে। কথাগুলো বললাম শান্তভাবেই, কিন্তু বুকের ভেতর তখন আমাদের উত্তেজনার উথাল পাতাল। তিনি রাজি না হলে আমরা কী করব। প্রস্তাব শুনে তিনি অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। হয়ত ভেবে নিলেন আদ্যোপান্ত। আমাদের হৃস্পন্দন দ্রুততর হল। একসময় তিনি মুখ খুললেন। হ্যাঁ, তিনি রাজি। স্বস্তির সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ল আমাদের। না, আর কোনো ভয় নেই। সব বাধা অনিশ্চয়তার সমাধান হয়ে গেছে। রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী হবে। এই উৎকট দম আটকানো বিজাতীয় পরিবেশের ভেতর আবার নিজস্ব সংস্কৃতির সজীব আলো-হাওয়াকে প্রাণভরে ছুঁতে পারব আমরা। মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারব কিছুদিনের জন্য।

কমিটির বাকি পদগুলো পূরণ হয়ে গেল অতি সহজেই। যারা আগে সাড়া দেন নি কিংবা বাদ পড়ে গিয়েছিলেন তাঁরাও এবার সাহস পেয়ে মহা উৎসাহে যোগ দেবার জন্যে তড়িঘড়ি ধেয়ে আসতে লাগলেন। বিপুল উত্তাল বিক্ষুব্ধতিহীন সে জোয়ার। প্রার্থীর প্রচণ্ড চাপে কমিটির আসন সংখ্যা বাড়াতে হল ব্যাপকভাবে। এক সময় অধ্যক্ষ হাইকেও দেখা গেল প্রার্থীর বিনীত ভঙ্গিতে। প্রথমদিন অনুকূল হলে তিনি এই কমিটির সভাপতি হতেন।

দেখতে দেখতে রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকীর জাতীয় কমিটি গঠিত হয়ে গেল। কমিটি যত ব্যাপক আর দায়িত্বশীল হয়ে উঠতে লাগল, আমরাও ঠিক সেই পরিমাণেই অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠতে শুরু করলাম। কমিটির কাজ পুরোদমে আরম্ভ হবার পর প্রায় হারিয়ে গেলাম আমরা। আমরা যে একদিন এই আয়োজনের পুরোভাগে ছিলাম, মূল উদ্যোক্তা ছিলাম, এর প্রথম অস্ফুট চালিকাশক্তি ছিলাম—সে কথাটা কারো কাছে আর প্রায় জানাই রইল না।

নির্ঝরণীর গান শেষ হল, হে নদী, এখন তোমার বিরতিহীন বিশাল গল্পের শুরু/ "আমি রাত্রি, তুমি ফুল ; যতক্ষণ ছিলে কুঁড়ি/ জাগিয়া চাহিয়াছিনু উদার আকাশ জুড়ি ;/ যখন ফুটিলে তুমি ফুরাল কাল,/ আলোকে ভাঙিয়া গেল রজনীর অন্তরাল ;/ এখন বিশ্বের তুমি।'

৫.

মোশতাক আর আমার কাজ কিন্তু শেষ হল না। দুটো উপ-কমিটিতে ছিলাম আমরা। এমনিতেই অনেক কাজ ছিল আমাদের কাঁধে। এ ছাড়াও যখন যেখানে যে কাজের দরকার এসে পড়তে লাগল কুণ্ঠাহীনভাবে এবং নিঃশব্দে তা-ই করে যেতে লাগলাম। এই বিশাল কর্মকাণ্ডের আমরা এখন কেউ নই—কিন্তু এর প্রথম স্বপ্ন আমরাই তো দেখেছিলাম। এই শতবার্ষিকীতো আমাদেরই রক্তের সন্তান। কোনো কাজের দরকার এসে পড়লে আমরা কি হাতগুঁটিয়ে বসে থাকতে পারি। আমাদের নীরব স্বেদে-ভালোবাসায় এর বর্ণিল আলোক উজ্জ্বলিত হোক।

ড. মুরশিদ এবং ড. দেবের কথা মনে হলে এখনো সংকোচ লাগে। তাঁরা ছিলেন আমাদের শিক্ষক, আমরা তাঁদের ছাত্র। আশা করি আমাদের মিথ্যাচারকে তাঁরা না জেনেই ক্ষমা করে রেখেছেন। আমি উদ্দেশ্যের স্বার্থে উপায়ের গুণগত মানকে বিসর্জন দেবার পক্ষে নই। কিন্তু একটা ছোট্টো মিথ্যা যখন তার লক্ষগুণ সত্যের চেয়ে শক্তিশালী হয়ে ওঠে তখন কী করা যেতে পারে?

দেখতে দেখতে কয়েকটা মাস কেটে গেল। সাতদিনব্যাপী জন্ম শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের

উদ্বোধনী ভাষণ দিলেন বিচরাপতি মোর্শেদ। উনি ভাষণটা ইংরেজিতে দিচ্ছেন শুনে প্রথমটায় দমে গিয়েছিলাম। আর যাই হোক রবীন্দ্রনাথের নিজের জাতি তাঁর জন্ম শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করছে ইংরেজি বক্তৃতা দিয়ে, এটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলাম না। বাংলাভাষার ওপর জনাব মোর্শেদের অধিকারের অপ্রতুলতার কারণে, তাঁর অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতেই, তাঁকে এই অনুমতি দেয়া হয়েছিল। কিন্তু অনুষ্ঠানের দিন যখন তিনি সুচারু উচ্চারণে তাঁর অনবদ্য ভাষণ শুরু করলেন তখন আমাদের সমস্ত ক্ষোভ যেন একমুহূর্তে ধুয়ে গেল। অসাধারণ বক্তৃতা করলেন বিচারপতি—আমাদের প্রত্যাশার চেয়ে অনেক সুন্দর। ভাষণটা শুধু গভীরই নয়, তলদেস্পর্শী এবং সুব্যাপ্ত। সবাই একবাক্যে এই অনন্য উদ্বোধনকে স্বাগত জানালেন। অভুতপূর্ব উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে জন্ম শতবার্ষিকী শুরু হল।

অনুষ্ঠানে বক্তা এলেন, আলোচক এলেন, নানান অঙ্গন থেকে জ্ঞানীগুণীরা এসে ভিড় জমালেন। অভিনেতা-অভিনেত্রী, গায়ক-বাদক, নতর্ক-নর্তকীদের কলকণ্ঠ আর নূপুর নিক্বনে উৎসবমুখর হয়ে উঠল চারদিক। বাঙালি সংস্কৃতির উত্তাল আলো-হাওয়াকে ফিরে পেল সারা দেশ। কেবল নীরব সংঘের নিশ্চুপ হয়ে যাওয়া সদস্যরাই সেই আলোবর্ণিল মঞ্চ থেকে বাইরে রয়ে গেল।

কয়েকটা মাসের একটানা কাজে আমাদের পড়াশোনা বেদম ক্ষতিগ্রস্ত হল। তবু আমি সামলে উঠলাম—এম. এ পরীক্ষার খানিকটা প্রস্তুতি আগেই সেরে রেখেছিলাম বলে। কিন্তু মোশতাক কিছুতেই শেষরক্ষা করতে পারল না। ও এমনিতেই ছিল ভালো ছাত্র। এম. এ তেও ভালো করতে চেয়েছিল। শেষ পর্যন্ত একটা বছর নষ্ট করতে হল ওকে।

তারুণ্যের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে ঘটনার দিকে এগিয়ে গিয়েছিলাম আমরা। যে যৌবন প্রতিনিয়ত শ্রেয়কে স্পর্শের স্পর্ধায় জীবনকে প্রণিত করে দুঃসাধ্যের রাস্তায়, আত্মবিস্মৃতের মত তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়, সেই যৌবনই ছিল সেদিন আমাদের একমাত্র এবং ক্ষমাহীন প্ররোচক। আর কেউ নয়। কিছু নয়। তবু আজ প্রায় তিরিশ বছর পর যখন পুরো ব্যাপারটার দিকে ফিরে তাকাই, তখন ঘটনাটার আর একটা অপঠিত পৃষ্ঠা খুলে যায় আমাদের সামনে। পুরো রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উদযাপন ব্যাপারটাকেই আমি তখন আর সাধারণ অর্থে দেখি না ; দেখি একটা ব্যতিক্রমী অর্থে। এই দেখাটা ঐতিহাসিক ; এর দৃষ্টি আমাদের সমাজের বিবর্তনের দিকে নিবদ্ধ। আমার মনে হয়, পাকিস্তানী যুগে বাঙালি সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার ষড়যন্তের বিরুদ্ধে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন যে দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল তাকে স্তব্ধ করে দেবার পর, দীর্ঘ একদশকের ব্যবধানে, পরোক্ষ ও অঘোষিত হলেও, রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর আয়োজন ছিল ঐ অপচেষ্টার বিরুদ্ধে বাঙালিত্বের দ্বিতীয় প্রধান সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ।

১৯৮৬

বিদায় অবন্তী
(পার্ল পাবলিকেশন)

*0000000002398*